



ব্যাচেলর অব এডুকেশন

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ

Teaching Business Entrepreneurship

EDBN 1431

রচনা

প্রফেসর ড. এম এ মান্নান
ফাওজিয়া আমিন দীনা
শেখ শাহবাজ রিয়াদ
মো. ইকরামুজ্জামান খান
মোছা. মাজেদা খাতুন
শাহনাজ বেগম

মূল্যায়ন

গাজী শাহ আল হেলালী
মোঃ মাস্টিন উদ্দিন
আলমগীর হোসেন

সম্পাদনা

শেখ শাহবাজ রিয়াদ

স্কুল অব এডুকেশন



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ

EDBN 1431

বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক

মোঃ জহির উদ্দিন বাবর

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক

রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়

প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১৮

পুনঃমুদ্রণ: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর- ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃমুদ্রণ করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0115-1

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনিট ১	মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রম	০১-১২
১.১	মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
১.২	ব্যবসায় উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	০৫
১.৩	ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন	০৯
ইউনিট ২	ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের উপযোগী শিখন-শিখনো পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন	১৩-২৪
২.১	বিদ্যালয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিখন-শেখানোর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি	১৩
২.২	অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কৌশল, পদ্ধতি ও দক্ষতা	১৬
ইউনিট ৩	শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ ও উন্নয়ন	২৫-৩২
৩.১	ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ	২৫
৩.২	দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ	২৮
৩.৩	মূল্যবাহীন ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ	৩০
ইউনিট ৪	ব্যবসায় উদ্যোগের পাঠপরিচালনা	৩৩-৪৪
৪.১. -৪.২	একক পাঠপরিচালনা	৩৩
৪.৩	শিখনফল ও শিখন কার্যক্রম	৩৬
৪.৪	শিখন-শেখানো পদ্ধতি কৌশল	৩৭
৪.৫	পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার	৩৯
৪.৬	দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং ব্যবহার	৪০
ইউনিট ৫	ব্যবসায় পরিচিতি	৪৫-৫৮
৫.১	ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৪৫
৫.২	ব্যবসায়ের আওতা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব	৪৮
৫.৩	ব্যবসায় পরিবেশ ও বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ	৫৩
ইউনিট ৬	ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা	৫৯-৭৮
৬.১	উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য	৫৯
৬.২	ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি	৬১
৬.৩	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব	৬৪
৬.৪	ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক	৬৬
৬.৫	বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা ও দূরীকরণের উপায়	৬৭
৬.৬	উদ্যোগ ও আত্মকর্মস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	৭০

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনিট ৭	ব্যবসায়ের আইনগত দিক	৭৯-৯৭
৭.১	ব্যবসায় আইনগত দিকের ধারণা ও গুরুত্ব	৭৯
৭.২	ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা	৮৩
৭.৩	ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব	৮৪
৭.৪	ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনা	৮৭
৭.৫	ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি	৮৮
৭.৬	নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ	৮৯
৭.৭	নেতৃত্বের গুণাবলি	৯২
৭.৮	ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা	৯৩
ইউনিট ৮	ব্যবসায় উদ্যোগ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মূল্যায়নের ভূমিকা	৯৮-১১৬
৮.১	মূল্যায়নের ভূমিকা: ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন	৯৮
৮.২	সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি ও ব্লুমস্ এর শিখন ক্ষেত্রসমূহ	১০০
৮.৩	সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের গুরুত্ব	১০৬
৮.৪	শ্রেণি অভীক্ষা ও অগ্রগতি যাচাই অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা	১০৬
৮.৫-৮.৬	বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তর পত্র মূল্যায়ন, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা, নিরীক্ষণ ও পরিশোধন	১০৭-১১৬
ইউনিট ৯	ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে পেশাগত উন্নয়ন	১১৭-১৩০
৯.১	ধারাবাহিক/অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন ও উন্নয়ন কৌশল	১১৭
৯.২	প্রতিফলনমূলক অনুশীলন	১২০
৯.৩	কর্মসহায়ক গবেষণা	১২৩
৯.৪	শিক্ষা সফর	১২৭

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রম

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে চলেছে। ব্যবসায়ের এরূপ প্রসারের ফলে শুধু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থারই উন্নতি হয়নি, সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের অপার দিগন্ত। ব্যবসায়কে তাই মানবসভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের সেতুবন্ধন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ সকল কারণে শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার পাশাপাশি ব্যবসায় শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি হচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগুলো শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি রচনা করার পাশাপাশি তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে উদ্যোক্তাসুলভ মনোভাব অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। এ ইউনিটে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রমের নিম্নোক্ত দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে—

১.১ মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.২ ব্যবসায় উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

১.৩ ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

১.১ মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় দর্শন ও আদর্শ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সমকালীন জীবনের চাহিদা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করতে হয়। এর পূর্বে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছিল। এ দীর্ঘ সময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলেও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন না হওয়ায় এর প্রতিফলন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আসেনি। তাই ২০১২ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই অংশ। বর্তমানে সারা বাংলাদেশেই ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম প্রচলিত আছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য শিক্ষাক্রমের মতো ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রমও যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জিত হবে।

শিক্ষাক্রমের ধারণা

শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা বা পরিকল্পনা। কে, কেন, কী, কিভাবে, কার সহযোগিতায়, কী দিয়ে, কোথায়, কত সময় ধরে শিখবে এবং যা শিখবে বা অর্জন করবে সেগুলো কিভাবে যাচাই করা হবে এসবের বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে থাকে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও শিখন চাহিদা এবং সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয় নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশনা-এসবই শিক্ষাক্রমের প্রতিপাদ্য বিষয়। শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতেই প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখনসামগ্রী এবং পরিচালিত হয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম। এসব প্রণয়নের নির্দেশনাও থাকে শিক্ষাক্রমে। এসব কারণে শিক্ষাক্রমকে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীল-নকশা বলা হয়ে থাকে।

২০১২ সালের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা

২০১২ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিয়ামক হিসেবে যে দলিলটি বিবেচিত হয়েছে তা হলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। এটিই শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়নের মূলভিত্তি। শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক ও এনসিটিবিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ৫ থেকে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি করে কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা হয়। সে কমিটি যে সকল নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন করেছে সেগুলো হলো—

- মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি;
- নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান;

- অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান;
- বিজ্ঞানমনস্ক ও কর্মমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ;
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি;
- তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি;
- জীবনদক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি;
- সব ধরনের বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান;
- বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান (মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২)

মাধ্যমিকস্তরের ব্যবসায় উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিক্ষাক্রম ২০১২)

১. ব্যবসায় ও ব্যবসায় উদ্যোগের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পর্কে জানা।
২. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা।
৩. নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।
৪. উদ্যোক্তাসুলভ মনোভাব সৃষ্টি ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।
৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।
৬. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক সেবার ধরন ও উৎসগুলো সম্পর্কে জানা।
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অবদান, সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৮. ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
৯. বাংলাদেশ ও বিশ্বের কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার জীবনী ও সফলতার কাহিনী জেনে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হওয়া।
১০. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

ব্যবসায় উদ্যোগের অধ্যয়নভিত্তিক শিখনফল

ক্রমিক নং	ব্যবসায় উদ্যোগের	
	অধ্যয়ন শিরোনাম	শিখনফল
১	ব্যবসায় পরিচিতি	১. ব্যবসায়ের ধারণা, পরিধি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবসায়ের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. শিল্পের ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাণিজ্যের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সেবার ধারণা ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
২	ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা	১. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে। ৩. ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবে। ৬. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি শনাক্ত করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা চিহ্নিত করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করতে পারবে। ১০. শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হবে।

ক্রমিক নং	ব্যবসায় উদ্যোগের	
	অধ্যায় শিরোনাম	শিখনফল
৩	আত্মকর্মসংস্থান	১. আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে। ৭. আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে।
৪	মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়	১. ব্যবসায়ের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ ও জনপ্রিয়তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ও এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবে। ৯. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবে। ১০. পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে। ১১. সমবায় সমিতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. সমবায় সমিতির গঠন ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। ১৪. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৫	ব্যবসায়ের আইনগত দিক	১. ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ট্রেডমার্কের ধারণা ও ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. লাইসেন্সের ধারণা ও এটি পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৪. ফ্রানসাইজ (Franchise)-এর ধারণা ও এটি পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৫. পেটেন্টের ধারণা, নিবন্ধনকরণ ও সুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. কপিরাইটের ধারণা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. কপিরাইট নিবন্ধন করার সুবিধা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. বিমার ধারণা ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৬	ব্যবসায় পরিকল্পনা	১. ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. আত্ম-বিশ্লেষণের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. আত্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে। ৫. প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. প্রকল্প প্রণয়নের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৭. প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো/ছক তৈরি করতে পারবে। ৯. বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী বিসিক শিল্প নগরী পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হবে।

ক্রমিক নং	ব্যবসায় উদ্যোগের	
	অধ্যায় শিরোনাম	শিখনফল
৭	বাংলাদেশের শিল্প	১. কুটিরশিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কুটিরশিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা শনাক্ত করতে পারবে। ৪. কুটিরশিল্প বিকাশের জন্য করণীয় চিহ্নিত করতে পারবে। ৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	১. ব্যবস্থাপনার ধারণা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সংগঠনের ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৫. নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৬. ভালো নেতার গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবে। ৭. নিয়ন্ত্রণের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ব্যবসায় অর্থায়নের ধারণা ও উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবে।
৯	বিপণন	১. বিপণনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিপণনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বণ্টন প্রণালির ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন পণ্যের বিপণন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বিজ্ঞাপনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমগুলো সনাক্ত করতে পারবে ও এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ব্যক্তিক বিক্রয়ের ধারণা ও একজন বিক্রয়কর্মীর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
১০	ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক সেবা	১. সহায়ক সেবার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার ধরন ও উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. শিল্পনীতিতে উল্লিখিত সহায়তাগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারবে।
১১	ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা	১. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যবসায়ের কারণে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৬. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১২	সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয়	১. দেশের সফল উদ্যোক্তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. দেশের সফল উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংগঠনগুলোর বর্ণনা করতে পারবে। ৩. দেশের সফল উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে পারবে। ৪. দেশের সফল উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার কাহিনী বলতে পারবে। ৫. স্থানীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকারেরভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। ৬. বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের জীবনী পাঠে অনুপ্রাণিত হবে।

ব্যবসায়ের উদ্যোগের জন্য অধ্যায় অনুযায়ী পিরিয়ড বন্টন

২০১২ সালের শিক্ষাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিষয়ভিত্তিক পৃথক পৃথক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং প্রতিটি পিরিয়ডের সময় বৃদ্ধি করা করা। ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে দৈনন্দিন ক্লাস রুটিনে মোট পিরিয়ড হলো ৬টি। প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০মিনিট। শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬ পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪ পিরিয়ড। দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ এর মেয়াদ ১৫মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড, পর মধ্যাহ্ন বিরতি ৪৫মিনিট। দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতি ২৫ মিনিট হবে। ব্যবসায়, মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পিরিয়ড সংখ্যা ও পিরিয়ডের ব্যাপ্তি উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের জন্য সাপ্তাহিক ক্লাসের সংখ্যা ৩টি এবং প্রথম সেমিস্টার ও বার্ষিক মিলে এক বছরে মোট ক্লাস সংখ্যা $(8c+8c) = ১৬$ টি। দুই বছরের মোট ক্লাস পাওয়া যাবে ১৯২টি। যদিও শিক্ষাক্রমে ব্যবসায় উদ্যোগের ১২টি অধ্যায়ের জন্য প্রত্যাশিত ক্লাস সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৪০টি। আশা করা যায় দুই বছরে ১৪০টি ক্লাসের মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যথার্থভাবে শিখনফল অর্জন করা যাবে।

অধ্যায় বিন্যাস ও পিরিয়ড বন্টন

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	ক্লাস সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	ব্যবসায় পরিচিতি	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা	১০
তৃতীয় অধ্যায়	আত্মকর্মসংস্থান	১০
চতুর্থ অধ্যায়	মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়	২০
পঞ্চম অধ্যায়	ব্যবসায়ের আইনগত দিক	১০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ব্যবসায় পরিকল্পনা	১০
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশের শিল্প	১০
অষ্টম অধ্যায়	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	১০
নবম অধ্যায়	বিপণন	১০
দশম অধ্যায়	ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক সেবা	১০
একাদশ অধ্যায়	ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা	১০
দ্বাদশ অধ্যায়	সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয়	২০
১২		১৪০

১.২ ব্যবসায় উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যে ভেজাল শব্দটি ভোক্তা সমাজে একটি অতি আলোচিত বিষয়। যে খাদ্যই আমরা ক্রয় করি বা গ্রহণ করি তাতেই আমাদের সন্দেহ থাকে যে সেটিতে কোনো রাসায়নিক মেশানো আছে কিনা। চারিদিকে কেবল ভেজাল ও মানহীন পণ্যের ছড়াছড়ি। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে বাসা বাধছে নানা ধরনের জটিল রোগ ব্যাধি। ফরমালিনযুক্ত খাবার ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে, লিভার ক্যান্সার, অ্যাজমা, অস্ফুটসহ নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সকল জটিল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে অনেক মানুষ। যারা বেঁচে থাকে তাদের কষ্টের অন্ত থাকে না। দেশের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর অতি মুনাফা লোভের কারণে দিনে দিনে মৃত্যুবুঁকি বাড়ছে। তারা শিশু খাদ্যেও ভেজাল মিশাচ্ছে। শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, দুধ, কোনোটাই আজ ক্ষতিকর রাসায়নিক থেকে নিরাপদ নয়। দুধ জাতীয় খাদ্য যেমন মিষ্টি, পনির ইত্যাদিতে ফরমালিন অবিকৃত থেকে যায়। আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, আপেল, কমলা ও আংগুরসহ সব রকমের ফল পাকাতে এবং টাটকা ও সতেজ দেখাতে যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হল ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথানল ও ফরমালিন। সস তৈরি হয় বিষাক্ত রঙ দিয়ে। কিন্তু ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চর্চা করে ব্যবসায় সমাজ রাষ্ট্রের কাছে সম্মানিত, জনগণের কাছে অনুকরণীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হতে পারেন। গঠন করতে পারেন বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায় উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য। পরিবার, গোষ্ঠি, সমাজ বা রাষ্ট্রে বসবাসকারি মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব ও চিন্তা-চেতনার দীর্ঘমেয়াদি প্রকাশ হচ্ছে মূল্যবোধ। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধ সব সময় ইতিবাচক হয়। যেমন- পিতামাতা, বয়োজেষ্ঠ্য ও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা ও সালাম দেয়া আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ। আবার, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি, বাণিজ্যে-বেসাতে লক্ষ্মী ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস। অন্যদিকে, নৈতিকতা শব্দটি গ্রিক শব্দ ইথস (Ethos) শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ মানব আচরণের মানদণ্ড। নৈতিকতা মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে জড়িত। নৈতিকতা বলতে মানুষের ভালো মন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করাকে বুঝায়। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক, মঙ্গলময় ও কল্যাণময় দিকের নির্দেশনা দেয়। অন্যায় থেকে ন্যায়, অধর্ম থেকে ধর্ম, অসত্য থেকে সত্য, অনুচিত থেকে উচিত পৃথকীকরণ বা নিবুপণের ক্ষমতা নৈতিক নীতিবোধ থেকে আসে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গঠন এবং দেশের জনগণের জন্য নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ যেমন প্রয়োজন তেমনি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং নৈতিকতা মেনে চলা একান্ত আবশ্যিক। ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলতে বুঝায় সর্বোচ্চ সততা বজায় রেখে ক্রেতা সাধারণকে না ঠকিয়ে নিজের লাভ ও ক্রেতাকে প্রদত্ত সেবা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জনগণ এবং ব্যবসায় উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করেই ব্যবসা পরিচালনা করা।

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সকলের মতো ব্যবসায়ী সমাজকেও ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু অধিক মুনাফা অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অসম প্রতিযোগিতা, রাতারাতি বড় লোক হওয়ার অযৌক্তিক স্বপ্ন, ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ, চাঁদাবাজি অনেকক্ষেত্রে নৈতিকভাবে দুর্বলমনা ব্যবসায়ীকে অন্যায় পথে ধাবিত করে। অন্যদিকে সৎ, দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী তার লালিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। তবে দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে ব্যবসায়িক নৈতিকতার প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন বা অন্য কোনো কারণেই হোক ব্যবসায় অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক নেতিবাচক খবর ও চিত্র চোখে পড়ে। মরা মুরগি কেনা-বেচা, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, নিম্নমানের পণ্য তৈরি বা বিক্রয়, ওজনে কম, ফরমালিনযুক্ত মাছ ও ফলমূল, পণ্য দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে মিথ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য দান, নির্মাণ কাজে নিম্নমানের দ্রব্য ব্যবহার, ঔষধে ভেজাল, এক শ্রেণির পরিবহন মালিকদের চলাচলের অযোগ্য যানবাহন রাস্তায় চালিয়ে মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি করানো, ইত্যাদি ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যকলাপের উদাহরণ। এসব অনৈতিক কার্যকলাপের ফলাফল ভয়াবহ। ভেজাল ঔষধ খেয়ে অনেক শিশু মারা গেছে এবং অনেক শিশু অসুস্থ হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ নানা রকম ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের এসব অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ না করা গেলে রোগাক্রান্ত মানুষদের একটি অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যার ফল হবে ভয়াবহ। নিম্নোক্ত কারণে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

- ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জন একটি বৈধ ও সম্মানজনক কর্ম। তাই এক্ষেত্রে অনৈতিক কার্যকলাপ ও আচরণ কাম্য নয়। সত্যবাদী ব্যবসায়ীকে মহান সৃষ্টিকর্তা অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষের উচিত ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখা।

- ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের ভালো-মন্দ ও কল্যাণ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে অবহেলা বা অনীহা ব্যবসায়ের জন্য মঙ্গলজনক নয়। যে ব্যবসায় মূল্যবোধ নেই সে ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ।
- বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। একমাত্র ব্যবসায় নৈতিকতাবোধ এই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে পারে। ব্যবসায়িগণ নিজেদের প্রস্তুতকৃত বা আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে জীবন ধারণ করে। তাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক পণ্য দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা।
- ঔষধপত্রে ভেজালের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজধানীর ঔষধের পাইকারি বাজার মিটফোর্ড থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার কার্টন নকল ও ভেজাল ঔষধ সারাদেশে যাচ্ছে, যা সেবন করে মারা যাচ্ছে অসংখ্য রোগী। কারণ ভেজাল ঔষধ খাওয়া মানে বিষ খাওয়া। ঔষধ প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের নৈতিক আচরণই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ তার সন্তানও এর শিকার হতে পারে।
- ব্যবসায় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিকতার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করলে ব্যবসায় সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক হবে। ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।
- ব্যবসায় অনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হলেও এর পরিণাম কখনও ভালো হয় না। অনেক ব্যবসায় প্রথমে ভালো ফলাফল করেও অনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যবসায়িকে সবাই ঘৃণা করে। সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে হলে ব্যবসায় নৈতিক আচরণ বা সত্য পথ অবলম্বনের বিকল্প নাই।

ব্যবসায় উদ্যোগে নৈতিকতা

প্রাথমিক অবস্থায় নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবসায়ের উৎপত্তি হলেও এক সময় মুনাফা অর্জনকে ব্যবসায়ের প্রধান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমান এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায় শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই নয়, এটি সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়িকে নিজের মুনাফা বৃদ্ধির চিন্তা করলেই হয় না, তাকে কিছু পক্ষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বুঝায়। সঠিক মাণের পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা সরবরাহ, যথাসময়ে যথাযথভাবে কর পরিশোধ করা, নির্ধারিত বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল যথাসময়ে পরিশোধ করা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন ভাতা ও মজুরি যথাযথভাবে পরিশোধ করা, সর্বোপরি দেশের প্রচলিত আইন যথাযথ মেনে সমাজের কল্যাণ সাধন করে ব্যবসায় পরিচালনা করাই হচ্ছে ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। ব্যবসায় উদ্যোগ একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং জনগণের সমর্থনের ওপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা সমাজের একজন সচেতন নাগরিক। তিনি একজন সৃজনশীল, চিন্তাশীল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। সমাজ থেকে যেমন তার কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেয়ার রয়েছে। তার অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার সম্মানও বাড়বে।

এ সকল দায়িত্বকে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে। যাদের উপর দায়িত্ব পালন করতে হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা, ভোক্তা, শ্রমিক-কর্মচারী। এসব পক্ষ কোনো না কোনোভাবে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা

Responsibility to Nation

জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায় পরিচালিত হোক এটাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ব্যবসায় স্থাপন ও অগ্রগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের চাহিদা মেটানো হলে এবং পণ্য বা সেবা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করা হলে সরকারের লক্ষ্য অর্জিত হয়। ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা;
- রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেমন তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ অপচয় না করা;
- আইন স্বীকৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করা;
- সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা;
- সরকারের নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

Responsibility to Society

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তবে ব্যবসায়কে সমাজের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

- বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সহায়তা করা, যেমন-রাস্তাঘাট মেরামত, নলকূপ স্থাপন, গরীব ও মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি;
- জাতীয় দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, সাইক্লোন, খরা, মঙ্গা, তীব্র শীতের সময় জনগণের পাশে দাঁড়ানো;
- পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা;
- পণ্যের মজুতদারি না করা;
- স্থানীয় জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ না করা;
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা;
- সমাজের প্রয়োজন মারফিক মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা;
- স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা

Responsibility to Customer and Consumer

ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। তাদের প্রতি ব্যবসায়িকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- পণ্য ও বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিক্রয় না করা;
- মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা;
- পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা;
- পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা;
- দুস্প্রাপ্য পণ্য বা সেবা সামগ্রী যেমন ঔষধ ও খাদ্য সামগ্রী ক্রেতাদের চাহিদা মতো সরবরাহ করা;
- যে পণ্যের যে গুণ নেই বিজ্ঞাপন দিয়ে তা প্রচার না করা।

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা

Responsibility to Workers

শ্রমিক ও কর্মচারীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যবসায় মুনাফা অর্জিত হয়। তাই তাদের স্বার্থকে অবহেলা করে ব্যবসা পরিচালনা করা যায় না। ব্যবসায় উন্নতির সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও সময়মতো বোনাস প্রদান করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। একজন ব্যবসায়িকে তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা;
- যোগ্য শ্রমিক-কর্মচারীদের পুরস্কার ও অযোগ্যদের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা;
- কাজের উপযুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও নিশ্চিত করা;
- প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা;
- বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গুরুতর অসুস্থ বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা;
- শ্রমিক-কর্মচারীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
- শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে ব্যবসায়ের অংশ মনে করা;
- উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা প্রদান।

১.৩ ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

পাঠ্যপুস্তকের ধারণা

শিক্ষা কার্যক্রমে সবচেয়ে শক্তিশালী নির্দেশনা ও শিখন সামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক। যে কোনো শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত নির্দিষ্ট বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের মেধা, প্রবণতা, বয়স, চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর ও অর্থবহ করার জন্য পাঠ্যসূচি বা বিষয়বস্তুর উপর তত্ত্ব, তথ্য নির্ভর সুলিখিত সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে ঐ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বলে। Textbook is a teaching tool or material which presents the subject matter defined by the curriculum. Its usually part of a pedagogical design. অন্যভাবে বলা যায়, A textbook is a book containing facts about a particular subject that is used by people studying that subject.

পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত শিখনসামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয়;
- পাঠ্যপুস্তকের আকার ও আকৃতি শিক্ষক-শিক্ষার্থীবান্ধব হতে হয়;
- শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয়;
- পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই শিখনফল অর্জন উপযোগী হবে;
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হবে;
- পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত তত্ত্ব, তথ্য ও বিষয়বস্তু নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন এর বিবেচ্যবিষয়

সাধারণত মূল্যায়ন বলতে বোঝায় পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যের আলোকে কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিচার করা। পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন হলো যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফলকে সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে তার মানযাচাই করা। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে যে কোনো পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন করতে হয়।

ক. প্রচ্ছদ

যখন একটি বই হাতে নেয়া হয়, তখন প্রথমেই এর প্রচ্ছদটিই সকলের চোখে পড়ে। আকর্ষণীয়প্রচ্ছদ একটি বইকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রচ্ছদ অনেক সময় বইয়ের ভেতরের আলোচনা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে সাহায্য করে। প্রচ্ছদ দেখে বোঝা সম্ভব বইটি কোনো বয়সীদের জন্যে রচিত হয়েছে। তবে শিশুদের উপযোগী বই হতে হলে সেই বইয়ের প্রচ্ছদে আকর্ষণীয় চিত্র থাকা কাম্য যাতে শিশুরা আগ্রহী হয়।

খ. বাঁধাই

যে কোনো পুস্তকের বাঁধাই দেখে সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। তবে বেশি পরিমাণে প্রকাশিত বইয়ের বাঁধাই সাধারণভাবে নিম্নমানের হয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তকগুলোর বাঁধাই অনেক সুন্দর ও মজবুত হয়।

গ. বইয়ের আকার

পুস্তক মূল্যায়নে পুস্তকের আকার অন্যতম বিবেচ্যবিষয় হিসেবে গণ্য হয়। অনেক পুস্তকের ক্ষেত্রে দেখা যায় আকার বড় হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় মার্জিন না রেখেই বই ছাপিয়ে ফেলে। আবার, পুস্তক ছাপানোর ক্ষেত্রে খরচ সাশ্রয়ের জন্য অনেক সময় মানসম্মতভাবে মার্জিন রাখা সম্ভব হয় না।

ঘ. ছাপার অক্ষরের আকৃতি

একটি ভালো পুস্তকে ব্যবহৃত অক্ষর আকৃতি পুস্তক মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সাধারণত একটি আদর্শ পুস্তকের জন্য ইংরেজিতে টাইমস নিউ রোমান এবং বাংলায় সূতনীতে ১২ ফন্ট আসা উচিত। প্রয়োজনবোধে তা কম বেশি হতে পারে। আর রিভিউ করার সময় দেখা উচিত তা প্রয়োজনীয় আকারের হলো কি না। কারণ ছোটদের বইয়ের ফন্ট ১৪/১৬ এমনকি এর চেয়ে বেশিও হতে পারে। আবার সাধারণ বইগুলোর ফন্ট যদি বেশি দেওয়া হয় তবে তা অনেক সময়ই দৃষ্টিকটু হতে পারে।

ঙ. বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা নিয়ে পর্যালোচনা

এই অংশটি বিশেষভাবে সেই সব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব বইয়ে একাধিক অধ্যায়ে একে রকমের বিষয় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পাঠ্যবই এবং সংকলিত বইগুলোর উদাহরণ বলা যেতে পারে। এমন বইগুলোতে প্রতিটি অধ্যায় ঠিক মতো উপস্থাপন করা হলো কি না বা যথার্থ ধারণা দেওয়া হলো কি না, পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য।

চ. ভাষা ও বিষয়বস্তু

একটি পুস্তক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাতে ব্যবহৃত ভাষা, ছবি, উদাহরণ এমন হওয়া উচিত যাতে যাদের উদ্দেশ্যে পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে সে শিখনফলগুলো অর্জন উপযোগী হয়।

ছ. বানান

বানানের ত্রুটি থাকলে তা পাঠের আনন্দ অনেকটাই নষ্ট করে দেয়। একটি আদর্শ পুস্তকের ক্ষেত্রে বানান রীতি এনসিটিবি, বিশেষক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানান রীতি অনুসরণ করাই উত্তম। এতে সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা বেশি থাকে। কাজেই পুস্তক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বানান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

জ. জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা

পাঠ্যপুস্তকগুলোতে এমন কোনো তথ্য, তত্ত্ব, উদাহরণ উল্লেখ করা যাবে না যা আমাদের জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোনো পুস্তক মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্যবিষয়।

ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় উদ্যোগ বইটি ২০১২ সালে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে বইটি নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের জন্য ওপরে বর্ণিত মূল্যায়ন ছকের আলোকে ব্যবসায় উদ্যোগ পুস্তকটি মূল্যায়ন করা হলো-

ক্র.নং	মূল্যায়নের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
ক.	প্রচ্ছদ	➤ প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। ➤ প্রচ্ছদের লেখা মানানসই।
খ.	বাঁধাই	➤ বাঁধাই মোটামুটি মজবুত। ➤ আরো মজবুত করার সুযোগ আছে।
গ.	বইয়ের আকার	➤ বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। সেই হিসেবে বই এর আকার মানানসই। ➤ আরো বড় হলে নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা যেত না।
ঘ.	ছাপার অক্ষরের আকৃতি	➤ ছাপার অক্ষরের আকৃতি ১৩। এটি শিক্ষার্থীদের বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ➤ তবে ইনার পৃষ্ঠায় লেখক ও সম্পাদকগণের পরিচয় লেখার ফন্ট আরো বড় হওয়া উচিত ছিল।
ঙ.	বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা নিয়ে পর্যালোচনা	➤ পুস্তকটিতে ১২টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনা গড়ে ১২ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আলোচনা ব্যক্তি নাতিদীর্ঘ। তবে আলোচনা-বিশ্লেষণ দীর্ঘ না হলেও এতে প্রয়োজনীয় তথ্য, তত্ত্ব ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কর্মপত্র স্থান পেয়েছে। ➤ সপ্তম অধ্যায় ‘বাংলাদেশের শিল্প’ এ দুটি শিখনফল আছে যেখানে বলা হয়েছে ‘বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে পারব এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব’। কিন্তু এ দুটি শিখনফল অর্জনের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সেখানে সন্নিবেশিত করা হয়নি।
চ.	ভাষা ও বিষয়বস্তু	➤ পুস্তকটিতে ব্যবহৃত ভাষা ও বিষয়বস্তু নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত এবং সহজ ও সাবলীল বলে প্রতীয়মান হয়েছে।
ছ.	বানান	➤ বইটি ব্যবহৃত শব্দের বানান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কিছু শব্দের বানানে ভুল আছে। আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।
জ.	জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা	➤ ব্যবসায় উদ্যোগ পুস্তকটি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সেখানে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশপ্রেম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ, কাজিফত পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনা পরিপন্থী কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

পাঠ্যপুস্তকের ভৌত দিক সম্পর্কে মতামত : (প্রত্যেকটি উক্তির জন্য একটি ঘরে টিক (✓) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে)

পাঠ্যপুস্তকের	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	মোটামুটি	সন্তোষজনক নয়	মোটাই সন্তোষজনক নয়
১. মলাট টেকসই		(✓)			
২. প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়		(✓)			
৩. প্রচ্ছদ বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে		(✓)			
৪. সাইজ (আকার)		(✓)			
৫. কাগজের মান			(✓)		
৬. চিত্র, ছবি, নকশা ইত্যাদির স্পষ্টতা			(✓)		
৭. চিত্র, ছবি, নকশা ইত্যাদির আকর্ষণীয়তা			(✓)		
৮. বাঁধাই			(✓)		
৯. ছাপার মান		(✓)			
১০. ফন্ট সাইজ		(✓)			

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- শিক্ষাক্রমের একটি কার্যকর ধারণা দিন।
- মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে কয়টি অধ্যায় আছে? কী কী?
- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
- পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ক. ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা লিখুন।
খ. ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত মাধ্যমিক ব্যবসায় উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা।
- ক. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
খ. বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়িক নৈতিকতাগুলো বর্ণনা করুন।
- ক. পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন এর বিবেচ্যবিষয়গুলো ব্যাখ্যা করুন।
খ. মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তকটি মূল্যায়ন করুন।

ইউনিট-২

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন

যে কোনো জাতির জন্য শিক্ষা অমূল্য সম্পদ। শিক্ষাকে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি সঠিকভাবে নিরূপণ করার হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষায় অগ্রগতির ইতিহাস ব্যাপক। শিক্ষার মাধ্যমে দেশের জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা হয়। সেজন্য এ শিক্ষা হওয়া উচিত বাস্তবভিত্তিক ও দক্ষতাভিত্তিক। শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তবক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়ন। বর্তমানে বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় একটি যুগোপযোগী বিষয়। এ বিষয়ের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন বাস্তবায়ন। এ অধ্যায়ে বিদ্যালয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কৌশলসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ বিদ্যালয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিখন-শেখানোর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি

২.২ -২.৩ অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কৌশল, পদ্ধতি ও দক্ষতা

২.১ বিদ্যালয় ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, সমাজের প্রয়োজনকে সম্মুখে রেখে, যুগের দাবীকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষা অর্জনের স্থান হিসেবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় একটি সামাজিক সংগঠন। বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংরক্ষণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় কার্যক্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। শ্রেণিকক্ষ হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। শ্রেণিকক্ষের উপযুক্ত পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, শিখন-শেখানো পদ্ধতির সফল প্রয়োগ, পঠন-পাঠনের পরিপূর্ণ সংযোগ, শিক্ষা উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার সবকিছুই শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক। শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যে কোনো বিষয়ের শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চাই উপযোগী পরিবেশ। ব্যবসায় উদ্যোগ একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বিষয়। এই বিষয়টি সঠিক পদ্ধতিতে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিবেশ। বিদ্যালয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তার উপর ভিত্তি করে এ পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, অন্যটি বাহ্যিক পরিবেশ।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের যে সকল উপাদান প্রয়োজন হয় এবং ঐ সকল উপাদানের মাধ্যমে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাই হলো বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানগুলোর উপর বিদ্যালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিখনীয় বিষয়বস্তু। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে কার্যকরী শিখন অর্জনে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানগুলো সহায়তা করে থাকে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, সময় তালিকা, উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, আসন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, শিক্ষা-উপকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শিক্ষকের প্রস্তুতি, শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি শিখন-শেখানো কাজের জন্য অপরিহার্য উপাদান। এই উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টির সঠিক প্রয়োগ সম্ভব।

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ বিষয় জ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্বলিত শিক্ষক উপযুক্ত সময়সূচি অনুসরণ করে, শ্রেণিকক্ষের যথাযথ বিণ্যাস করে, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এছাড়া শিক্ষক বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ও শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরির মাধ্যমে পাঠে আগ্রহ হবেন। এভাবে একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের

উন্নয়ন সাধন করবেন। এ বিষয়ের জন্য আলাদা নির্ধারিত কক্ষ নির্দিষ্ট করা থাকলে শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষটি সাজিয়ে নিতে পারেন। যা শিক্ষার্থীর শিখনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে বিশেষ প্রভাব ফেলবে এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষণ ফলপ্রসূ হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এ সকল উপাদানের সঠিক সমন্বয় সম্ভব। শিক্ষকের আন্তরিকতা, উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানসমূহ হলো :

• সময় তালিকা • উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ • পর্যাপ্ত আসন ব্যবস্থা • আলো বাতাস • শিক্ষা উপকরণ • শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি • বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	• শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক • বিদ্যালয়ের সাথে অভিভাবকের সম্পর্ক • সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালন দক্ষতা • শিক্ষকের আগ্রহ ও আন্তরিকতা • বিদ্যালয়ের কর্ম পরিবেশ • অফিস ব্যবস্থাপনা • বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা
--	--

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উন্নয়ন কৌশলগুলো হলো :

• যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ • শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দান • ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের জন্য পাঠ উপযোগী শ্রেণিকক্ষ সৃষ্টি • শ্রেণিকক্ষ যথাযথ সজ্জিতকরণ	• শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়ন • অভিভাবকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন • তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি • পাঠাগারে বিষয় সংশ্লিষ্ট পুস্তকের ব্যবস্থা করা • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা
--	---

বাহ্যিক পরিবেশ

অভ্যন্তরীণ পরিবেশের মতো বিদ্যালয়ের বাইরের কিছু উপাদান বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। বাহ্যিক পরিবেশের এ উপাদানগুলো সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয়ের কোনো ভূমিকা থাকে না। বিদ্যালয় স্বেচ্ছায় এ উপাদানগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। এ সকল উপাদান দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ বলা হয়।

বিদ্যালয়ের অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা, জনগণের জীবনধারা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, জলবায়ু, রাজনৈতিক পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সরকারি নীতি ইত্যাদি বাহ্যিক পরিবেশের উপাদান বিদ্যালয়ের শিখন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

বিদ্যালয়ের আশেপাশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হলে শিক্ষার্থী সময় মতো সহজেই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে। এর ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সহজ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় সমাজ সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সমাজ ও বিদ্যালয়ের সুসম্পর্কের সঙ্গে শিক্ষার উন্নয়ন জড়িত। শিক্ষার উন্নয়ন ও সমাজের সদস্যদের সচেতনতাবোধ একসূত্রে গাঁথা।

সার্বিক দিক থেকে সামাজিক সচেতনতা অর্জিত হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে তা প্রভাবিত করে। এতে করে কমিউনিটির নিকট বিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে। সুতরাং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জেন্ডার সচেতনতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ উন্নয়ন সাধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশের উপাদান

বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো :

• বিদ্যালয়ের অবস্থান • যোগাযোগ ব্যবস্থা • সামাজিক অবস্থা • রাজনৈতিক পরিবেশ • ধর্মীয় মূল্যবোধ • জনগণের জীবনবোধ • জলবায়ু	• আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি • শিক্ষাবিষয়ক সরকারি নীতি • কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র • শিল্প ও সংস্কৃতি • তথ্য ও প্রযুক্তি • স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে সম্পর্ক • উৎপাদন ব্যবস্থা।
---	--

বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ উন্নয়ন কৌশল

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশের উন্নয়ন অত্যাবশ্যিক। বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ উন্নয়ন একটি জটিল বিষয়। কারণ এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কাজ করে না। এটা নির্ভর করে সরকারি নীতিমালা, সামাজিক সচেতনতা ও রাজনীতিবিদদের সঠিক ভূমিকা পালনের উপর। বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশের উন্নয়ন কৌশলগুলো হলো :

• সচেতন সমাজ সৃষ্টি। • স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি। • বিদ্যালয়ের আশপাশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। • সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা। • জেভার শিক্ষার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেভার সচেতনতা সৃষ্টি।	• আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন। • বিদ্যালয় ও সমাজের সুসম্পর্ক স্থাপন। • জনগণের জীবনবোধ উন্নত করা। • তথ্য প্রযুক্তির ব্যবস্থা • নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। • আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন।
---	---

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উপায়

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উপায়গুলো হলো

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ;
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংবলিত শ্রেণিকক্ষ তৈরি;
- প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণ;
- শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- বিদ্যালয় ও সমাজের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন;
- পাঠাগারে প্রয়োজনীয় পুস্তকের ব্যবস্থা করা;
- বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, মেলা ইত্যাদির আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা;
- শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা;
- আধুনিক উপকরণ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগের উপযুক্ত শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।

২.২ অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কৌশল, পদ্ধতি ও দক্ষতা

শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। উপযুক্ত শিখন শেখানো পদ্ধতির উপর এ কাজটি নির্ভর করে। শিখন-শেখানো কথাটি আভিধানিকভাবে দ্বিমুখী অর্থ বহন করে। এখানো শেখানো এবং শেখা এই উভয়মুখী কাজকে সহজ করে তোলার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার নাম অংশগ্রহণমূলক শিখন। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয়তার দুটি ক্ষেত্র হচ্ছে মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে। যার মাধ্যমে কিছু সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী চিন্তা করে সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করে। দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে-কলমে কাজ করে শেখা। অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা বেশি বিবেচনার দাবী রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা অর্জন সহজ হয় যা অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব।

আমরা জানি, মানুষ এক ধরনের কাজে দীর্ঘ সময় মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার ব্যক্তি বয়স্কদের চেয়ে কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি ৮ থেকে ১০ মিনিট, তাও আবার নির্ভর করে কাজটি কতটা আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক তার উপর। আলোচনা, দলগত কাজ, গল্প বলা, লেখা, আঁকা, বিতর্ক, অভিনয়, হাতে-কলমে কাজ, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে অংশগ্রহণমূলক শিখন।

শিক্ষাকে বলা হয় ব্লক প্রক্রিয়া। ব্লকের উপর ব্লক স্থাপন করে বিরাট ইমারত তৈরি করা হয়। একইভাবে জানা অভিজ্ঞতা জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনে সহজে সহায়তা দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীর জীবন থেকে উপমা, উদাহরণ দিয়ে পূর্বলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে।

একজন শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তার সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্যসম্পন্ন। সকলেরই শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে সবাই শিখবে। কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে ঐ শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ইতিবাচক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে

- শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানা বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধকরণ;
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন;
- আগ্রহ ও আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করা;
- মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে আচরণের কাক্সিকত ও ইতিবাচক পরিবর্তন করা;
- বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জন ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ;
- মুখস্থ করার অভ্যাস পরিহার করা;
- বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করা।

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সফল ও কার্যকর করতে অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়নের জন্য জোড়ায় কাজ, দলগত আলোচনা, মাথা খাটানো, ভূমিকাভিনয়, সতীর্থ শিখন, অনুসন্ধান ও সমস্যা- সমাধান, ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, কেস স্টাডি ইত্যাদি পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। নিম্নে পদ্ধতি ও কৌশলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

জোড়ায় কাজ

অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়নের জন্য একজন শিক্ষককে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। জোড়ায় কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কৌশল। এক্ষেত্রে দু'জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন কাজ সম্পন্ন করা হয়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের প্রতি দুজন শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় চিন্তা, অনুভূতি, কথা, কাজ ও পরামর্শ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন। এর ফলে শিক্ষার্থী পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। পাশাপাশি বসা দু'জন শিক্ষার্থীর জোড়া হতে পারে, সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থীর জোড়া হতে পারে, ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর জোড়া হতে পারে, জোড় ও বিজোড় রোল নম্বরধারী শিক্ষার্থীর আলাদা জোড়া হতে পারে, অথবা লটারির মাধ্যমে জোড়া হতে পারে। শিক্ষক যে কোনো শর্ত সাপেক্ষে শিক্ষার্থীর জোড়া নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জোড়া তৈরি করে প্রত্যেক জোড়াকে-আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কিংবা একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের সুবিধা অথবা অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠনের জনপ্রিয়তার কারণ লিখতে দিতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় এবং তথ্যের আদান-প্রদানের ফলে শিখন ব্যবধান দূর হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমী দূর হয়। পাঠে বৈচিত্র্য আসে এবং শিখন ফলপ্রসূ হয়।

জোড়ায় কাজের সুবিধা

- অল্প সময়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়;
- অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের সমস্যার সমাধান করা যায়;
- শিক্ষার্থীর আসন পরিবর্তন করতে হয় না;
- শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়;
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয়।

অসুবিধা

- পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ কম;
- একই ধারণার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

দলগত আলোচনা

দলগত আলোচনা হচ্ছে একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে বিভক্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দেশ্যভিত্তিক পারস্পরিক মতামত বা ধারণা বিনিময় বা কথোপকথন বা সুচিন্তিত ক্রিয়াকলাপ। মূলত দলগত আলোচনা বলতে বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষক যখন কোনো বিষয়ে কতিপয় শিক্ষার্থীর সাথে তথ্য বা ধারণার বিস্তার বা অভিজ্ঞতা বিনিময় বা পরস্পরের মতামত আদান-প্রদান করে তাকেই বোঝায়। সাধারণত এ পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে দলভুক্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে ধারণা বিনিময় করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শিক্ষক এ আলোচনার সহায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং তার ভূমিকা গৌণ থাকে। দলগত আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে দলগতভাবে পারস্পরিক মত বিনিময় ও উন্মুক্ত আলোচনা করার সুযোগ পায়। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সাথে তথ্য ও ধারণা বিনিময়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ পদ্ধতি প্রয়োগে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নিজের অবস্থা বুঝতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবে, ফলে আলোচনায় কেউ একঘেয়েমি বোধ করে না।

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষক এ পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে নেবেন। এরপর একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। দলগত কাজের জন্য শিক্ষক সাধারণত- প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে অথবা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের জনপ্রিয়তার কারণ এ ধরনের চিন্তন দক্ষতা যাচাইমূলক সমস্যা নির্দিষ্ট করে দিবেন। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনা এবং মতামতের ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছাবে। এভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানার ঘাটতিগুলো পূরণ হবে। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে মতামতের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলো পোস্টার পেপারে লিখবে। নির্দিষ্ট সময় শেষে দলনেতা উপস্থাপন করবে ও উপস্থাপন শেষে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। এভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে যে কোনো বিষয়ে সঠিক ও নির্ভুল সমাধান হতে পারে।

দলগত আলোচনার সুবিধা

- দলগত আলোচনার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সল্প সময়েরে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমস্যার সহজ এবং সঠিক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়;
- সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন তথ্যের আদান-প্রদান করা যায়। যার প্রেক্ষিতে অধিকতর উত্তম তথ্যের সন্নিবেশ করা যায়;
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়;
- শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে;
- পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ফলে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে সমবেতভাবে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

দলগত আলোচনার অসুবিধা

- দলীয় আলোচনায় দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সমস্যা হয়;
- বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না এবং সময় বেশি প্রয়োজন হয়;
- দলের মধ্যে অধিক মত সৃষ্টির ফলে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে;
- মত ভিন্নতার কারণে আলোচনার গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে;
- শ্রেণি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে;
- শ্রেণিকক্ষে স্থান সংকুলানের সমস্যা হতে পারে।

দলগত আলোচনার প্রয়োগ কৌশল

- দলগত আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষক দলগঠন, সময় ও শ্রেণি শৃঙ্খলতা ইত্যাদি নিয়ে সঠিক নির্দেশনা দিবেন;
- নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন;
- শিক্ষার্থীদের দল ভিত্তিক নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে দিবেন;
- শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মপত্র ব্যবহার করতে পারেন;
- আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য শ্রেণিতে উপস্থাপন করবেন;
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করবেন।

দলগত কাজের উপস্থাপন

দলগত কাজের উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক নির্ধারিত সময় শেষে সকল দলের কাজ সংগ্রহ করবেন। নির্দিষ্ট দলের দলনেতাকে তাদের সম্পাদিত কাজ উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করবেন। উপস্থাপন শেষে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর অথবা আলোচনা হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল দলের কাজ উপস্থাপন করা হবে। সর্বশেষে শিক্ষক প্রত্যেক দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমস্যার সমাধান নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে একমত হবেন এবং গঠনমূলক সমালোচনা করার মাধ্যমে সমাপ্তি টানবেন।

সতীর্থ শিখন

একই শ্রেণির, একই বৈশিষ্ট্যের কিংবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে সতীর্থ শিখন বলে। এটি একটি দলভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি। দলগত শিখনে ছোট অথবা বড় দলের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যে কোনো একজন শিক্ষার্থী দ্বারা অন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান প্রক্রিয়াকে সতীর্থ শিখন বলে।

যেহেতু একটি শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থী থাকে সেহেতু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য মাঝে মাঝে মেধাবী শিক্ষার্থী দ্বারা সতীর্থদের সাথে আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজে সহায়তা করার নাম সতীর্থ শিখন। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষক বিষয়বস্তু ও বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত সহজ সমস্যা চিহ্নিত করে দিবেন। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি সক্রিয় থাকে এবং তাদের মধ্যে শেখার এবং শেখানোর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। এতে করে অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের সমস্যার সমাধান ও অনেকটাই সম্ভব হয়।

সতীর্থ শিখনের সুবিধা

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পায়।
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়।
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আনতে সহায়ক হয়।
- শ্রেণির কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

সতীর্থ শিখনের অসুবিধা

- শিক্ষার্থীদের ভিন্নমত পোষণের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষায় সমস্যা হতে পারে।
- সমস্যা সমাধানে সময় বেশি লাগতে পারে।

২.৩ অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান

সাধারণভাবে অনুসন্ধান বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোনো ঘটনার কারণ ও ফলাফল উদ্ঘাটন করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসাবে অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজ হলো পাঠসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়, সমস্যা বা কোনো ঘটনার কারণ ও ফলাফল খুঁজে বের করা। এ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে। আবার যে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সাধারণ ধারণা রয়েছে কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানতে আগ্রহী তাও এর মাধ্যমে জানতে পারে। এটিকে স্বল্প পরসরে গবেষণাধর্মী কাজও বলা যায়। এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রধানত শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করা। তথ্যের উৎস দু'ধরনের, ১. প্রাথমিক উৎস যা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পাওয়া যায়, ২. সেকেন্ডারি উৎস যা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা রিপোর্ট, বই-পুস্তক ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বাস্তবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে পারবে। সমস্যাটি সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করতে বা মতামত দিতে পারবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমস্যটি সমাধানের উদ্যোগও নিতে পারবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণে সচেষ্ট হবে।

অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজ সম্পন্ন করার ধাপসমূহ

সমস্যা নির্বাচন

সমস্যা নির্বাচন বা সমস্যা চিহ্নিত করা হচ্ছে অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধানের কাজের প্রথম ধাপ। শিখনফল ও বিষয়বস্তুর আলোকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়কে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

উদ্দেশ্য নির্ধারণ

সমস্যা নির্বাচন করার পর অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধানকাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। এ কাজ শুরু করার পূর্বে কাজটি কেন করা হবে এবং কাজের ফলাফল থেকে কী জানা যাবে তা নির্বাচন করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য নির্ধারণ। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। সমস্যার প্রকৃতির উপর এটি নির্ভর করে।

অনুমিত সিদ্ধান্তগ্রহণ

অনুমিত সিদ্ধান্ত হল সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনুমাননির্ভর ধারণা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সাধারণত এটি কাজ করার পূর্বে নির্ধারণ করতে হয় এবং এ ধারণা প্রমাণ করার লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিকল্পনায় থাকবে:

- তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি
পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা প্রকাশিত দলিলপত্র কীভাবে পর্যালোচনা করা হবে তার বর্ণনা যেমন- তথ্য সংগ্রহ কিংবা সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা ইত্যাদি।
- তথ্য সংগ্রহের পরিধি
কোথায়, কত জনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে কিংবা কোনো কোনো দলিলপত্র পরীক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি।
- কাজটি সম্পন্ন করতে কত সময় প্রয়োজন
- কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে
- প্রতিবেদনটি কীভাবে রচনা করা হবে ইত্যাদি।

উপকরণ (Instruments/Tools) তৈরি

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা, চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ, সিডিউল ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। এ ধরনের উপকরণ এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে:

- প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ না পড়ে;
- অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হয়;
- সকলের নিকট সহজে বোধগম্য হয়।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

সাধারণত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি ও নিরাপত্তার বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধকরণ

বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং চাহিদা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যাবলি প্রয়োজন অনুযায়ী সারণি, গ্রাফ এবং চার্টে সাজাতে হবে।

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ফলাফল প্রস্তুত

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের (শ্রেণিবদ্ধকৃত) উপর মন্তব্যই হচ্ছে বিশ্লেষণ। গড়, শতকরা হার তুলনা, আকার, আকৃতি, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির সাহায্যে মন্তব্য করতে হয়। এর মাধ্যমেই অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজের ফলাফল পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়।

সুপারিশ প্রণয়ন

তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ও উদ্দেশ্যের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করতে হয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

অনুসন্ধান ও সমস্যার সমাধানকাজে সংগঠিত সকল কার্যক্রমের আলোকে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। প্রতিবেদনের শুরুতে কাজের শিরোনাম, কাজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণি ও রোল নম্বর, তত্ত্বাবধানকারী শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশমালা বিন্যস্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

সমস্যার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সমস্যা বা বিষয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমস্যা নির্ধারণের সময় শিক্ষককে এগুলোর বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার। এসব বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

- নির্ধারিত সমস্যাটি হবে অবশ্যই অর্থবহ ও আনন্দদায়ক;
- সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে;
- সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের জীবন চাহিদাভিত্তিক হবে;
- সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু পূর্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- সমস্যা শিক্ষার্থীদের নিকট পরিপূর্ণরূপে স্চ্ছ হতে হবে;
- সমস্যার সমাধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই খুঁজে বের করবে;
- সমস্যাটির অবশ্যই শিক্ষাভিত্তিক মূল্য থাকতে হবে।

অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধানের সুবিধা

অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা হলো-

- শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটায়;
- শিক্ষার্থীর যৌক্তিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ায়;
- পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়;
- সরেজমিনে কাজ করে প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করে;
- শিক্ষার্থীকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে;
- দলগত কাজ করার মনোভাব সৃষ্টি করে;
- শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে;
- নিজে কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বাড়ায়;
- শিক্ষার্থীকে নিজে আবিষ্কৃত তথ্যাবলির মাধ্যমে শিখনে অভ্যস্ত করে;
- আনন্দদায়ক উপায়ে শিখন অর্জনে সহায়তা করে;
- বিভিন্ন মতামত যাচাই-বাছাই করতে সহায়তা করে;
- নতুন পরিবেশে কাজ করতে সহায়তা করে।

অসুবিধা

অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অসুবিধা হলো-

- এ পদ্ধতি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ বিধায় বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো অংশের পেছনেই অনেক সময় চলে যায়। ফলে পাঠ্যসূচি শেষ করতে সময় বেশি লাগে;
- সকল মেধার শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সমাধানে পৌঁছতে সমস্যা হয়;
- যথাযথ সমাধান খুঁজে পেতে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করতে না পারলে শিখনের প্রতি তার আগ্রহ নষ্ট হয়।

ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপন

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন তথা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, শুধুমাত্র শুনে বা কোনো কিছু পড়ার মাধ্যমে মানুষ যতটা শেখে তার চেয়ে অধিক শেখে কোনো কিছু দলীয় আলোচনা, দেখা, পরীক্ষণ ও হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপন, সিডি, ভিসিডি, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু উপস্থাপনকে বোঝায়। গতানুগতিক শিখন-শেখানো পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজ, আনন্দদায়ক ও কার্যকর হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যে কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট, দেখা থেকে অদেখা বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

যে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি। যদি কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিকট সম্পূর্ণরূপে নতুন হয় সে বিষয়বস্তু শুরু করার পূর্বে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিরূপ ধারণা রয়েছে তা যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। আবার পূর্ববর্তী পাঠের সাথে বর্তমান পাঠের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে ডিজিটাল বিষয়বস্তু উপস্থাপন সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি সম্পর্কিত একটি স্লাইড প্রদর্শনের পর শিক্ষার্থীরা কি দেখতে পাচ্ছে তা তাদের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। চিহ্নিত বিষয়গুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বোর্ডে কাজ করানো যায় অথবা একক, জোড়ায়, বা দলগত কাজ করতে বলা যায়। বিষয়সংশ্লিষ্ট ছবি অথবা ভিডিও দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে একক, জোড়ায় অথবা দলগত কাজ করিয়ে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করানো যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতায় বিকাশ ঘটে। বিমূর্ত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সামনে মূর্ত করে উপস্থাপনের সুযোগ হয়। যার ফলে শিখন বাস্তবসম্মত এবং স্থায়ী হয়।

প্রশ্নোত্তর

শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি। ছোট ছোট প্রশ্ন করে এবং প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যখন কোনো বিষয় শিক্ষার্থীদের জানার ও বোঝার চেষ্টা করে তখন তাকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে কতকগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝাতে পেরেছে কিনা তা জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের অভিমত জেনে নেন এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখেন। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে বুঝাতে না পারলে শিক্ষক উক্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে একটি প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের মেধার শিক্ষার্থীদের করা হয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের জানা না থাকলে শিক্ষক নিজে সে প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে শিক্ষার্থীদের দিয়ে সৃষ্ট উত্তরের পুনরাবৃত্তি করেন। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ কম থাকে। এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের উপর।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের ভাব আদান-প্রদানের প্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়;
- জটিল ও কঠিন বিষয় সহজে বোধগম্য হয়;
- অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা যায়;
- শ্রেণি শৃঙ্খলার সমস্যা হয় না।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধা

- প্রশ্ন করার দক্ষতার অভাব থাকলে মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে;
- শিক্ষকের বিষয়জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে এই পদ্ধতির বাস্তবায়নে সমস্যা হয়।

প্রশ্ন করার সময় শিক্ষকের যে সকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় তা হলো-

- প্রশ্ন সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে;
- প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও বিষয় সংশ্লিষ্ট হতে হবে;
- প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হতে হবে
- শিক্ষার্থীদের উত্তর ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রশ্ন করার সময় জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন এধরনের মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- পাঠ সম্পৃক্ত প্রশ্ন যথাসময়ে করতে হবে।
- চিন্তন দক্ষতা যাচাইমূলক প্রশ্ন করতে হবে।
- সমগ্র শ্রেণির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে হবে।

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি একটি আধুনিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ঘটনা শিখনের উদ্দেশ্যে পর্যালোচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি ঘটনার উপর লিখিত বিবরণ তৈরি করে তা বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বা জোড়ায় বা ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত ঘটনার উপর ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ঘটনাটি বাস্তব বা কাল্পনিক হতে পারে। তবে ঘটনার সারাংশ শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। সমস্যা সম্পর্কে সচতেনতা বৃদ্ধির জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কেস স্টাডি ব্যবহার করা হয়। এটি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমস্যা উপলব্ধি ও সমাধানের প্রক্রিয়া তুলে ধরার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি একটি উত্তম মাধ্যম। এ পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একটি ঘটনা থেকে বিভিন্নমুখী শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিক আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এটি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী পদ্ধতি। সহজ উপায়ে সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধানের পথ লাভ করা যায়। অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে কোন একটি সমস্যার একাধিক সমাধান পাওয়া যায়।

নমুনা

জনাব সালমা লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে চলে গেলেন। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়াশুনার প্রেক্ষিতে আত্মকর্মসংস্থানের প্রবল বাসনা তার মধ্যে ছিল। পারিবারিক কাজের পর অবসর সময়ে কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের জমানো স্বল্প পুঁজি নিয়ে তার বাড়ির আঙ্গিনায় স্বল্প পরিসরে একটি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করলেন। ধীরে ধীরে তার খামারের আয়তন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি এর মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হলেন এবং বর্তমানে তার খামারে আরও পাঁচজন বেকার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলো। এতে তার পরিবার ও সমাজ উপকৃত হলো।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক উপরোক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শিখন বাস্তবায়ন করবেন এবং মাধ্যমিক স্তরে গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করবেন।

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ক. বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী ?
- খ. অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রম কেন প্রয়োজন?
- গ. জোড়ায় কাজের সুবিধাগুলো লিখুন।
- ঘ. অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধান কাজের ধাপসমূহ লিখুন।
- ঙ. সতীর্থ শিখন কার্যকরী করার উপায় লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১.ক. ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ বিশ্লেষণ করুন।
 - খ.এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির উপায়গুলো ব্যাখ্যা করুন।
- ২.ক. দলগত আলোচনা পদ্ধতি কী?
 - খ. অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়নে দলগত আলোচনার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
- ৩. ক. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
 - খ. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষার প্রশ্ন করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনায় আনবেন তা লিখুন।

ইউনিট ৩ : শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ ও উন্নয়ন

যে সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন সেগুলোই হচ্ছে শিখন শেখানো সামগ্রী। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে শিক্ষার্থী তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সকল উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার আচরণে কাজক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারে সে সকল উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী মাধ্যমকে শিখন-শেখানো সামগ্রী বলা হয়। সার্থক ও কার্যকর শিক্ষণে যে সকল সহায়ক উপকরণ বা সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলোই একত্রে শিখন শেখানো সামগ্রী। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে দৃষ্টিনির্ভর, শ্রুতিনির্ভর বা শ্রবণ-দর্শন নির্ভর উপকরণ সবই শিক্ষার্থীর সফল ও ফলপ্রসূ শিখনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক এবং পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজ ও বোধগম্য করতে শিখন ও শেখানো সামগ্রীর বিকল্প নেই। এ সামগ্রীর মধ্যে মূল্যবিহীন ও স্বল্পমূল্যের উপকরণ যেমন রয়েছে তেমনি দুলভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণও আছে। এ উপকরণ ও সামগ্রীর মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সংগ্রহ বা ক্রয় করতে হয় এবং কিছু কিছু নিজেদের তৈরি করতে হয়। শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই পাঠের উদ্দেশ্য ও শিখনফল অনুযায়ী এগুলো সংগ্রহ ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া পাঠের বিষয়বস্তু ও উপকরণের সূষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কেও শিক্ষকের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। এই ইউনিটে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো সামগ্রীসহনিস্তোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ

৩.২ দুলভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

৩.৩ মূল্যবিহীন ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষণ উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, আইসিটি সামগ্রী-ভিডিও, টিভি, ইন্টারনেট

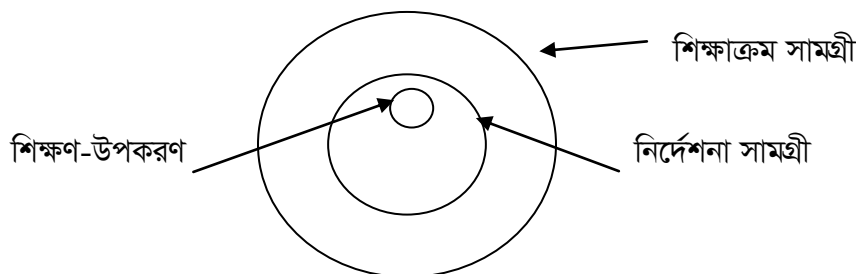
৩.৪ অন্যান্য সামগ্রী

পাঠ ৩.১ : ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এবং পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজ ও বোধগম্য করার জন্য যে সকল ছবি, চার্ট, মডেল, নকশা, মানচিত্র, গ্লোব ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় সেগুলোই ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ। শ্রেণি কার্যক্রমে এসব শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজ, স্থায়ী, প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

শিখন শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ

শিক্ষার্থীর শিখনকে সহায়তা করতে ও সূষ্ঠ শ্রেণিকার্যক্রম সম্পন্ন করতে শিক্ষক শিখন শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করেন। এগুলোর কিছু তিনি সংগ্রহ ও উন্নয়ন করেন, কিছু ক্রয় করেন, কিছু অবধারিতভাবে প্রতিষ্ঠানে থাকে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নানা ধরনের শিক্ষাক্রম সামগ্রী, নির্দেশনা সামগ্রী ও শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন পড়ে। এর কোনোটির গুরুত্বই কম নয়। শিক্ষণ উপকরণ, নির্দেশনা সামগ্রী এগুলোর সমন্বয়ে শিক্ষাক্রম সামগ্রী গঠিত হয়। শিক্ষাক্রম সামগ্রী শিক্ষার্থীর শিখনে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।



শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহৃত সামগ্রী ও উপকরণ

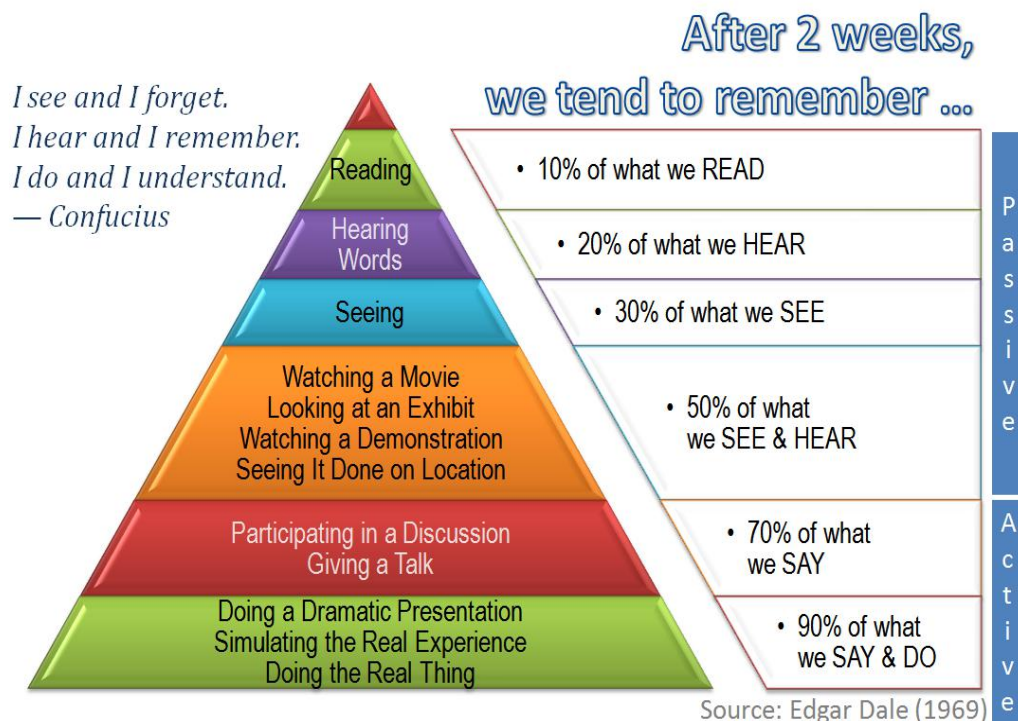
ওপরের চিত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাক্রম সামগ্রী, নির্দেশনা সামগ্রী ও শিক্ষণ উপকরণ সবগুলোই প্রয়োজন রয়েছে। শিখন শেখানো কার্যক্রমকে সফল করতে শিক্ষণ উপকরণ (চার্ট, পোস্টার, ছবি, মডেল ইত্যাদি) ও নির্দেশনা সামগ্রীর (মাল্টিমিডিয়া, রেডিও, টেপেরেকর্ডার ইত্যাদি) যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি শিক্ষাক্রম সামগ্রীরও (কক্ষ, বেঞ্জ, টেবিল, চেয়ার, বোর্ড, মার্কার, বই ইত্যাদির) প্রয়োজন রয়েছে।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের অনেক বিষয়বস্তুই বিমূর্ত। বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থাপন করতে পারলে তারা তা সহজে গ্রহণ করে। ব্যবসায় উদ্যোগের বিষয় বাস্তবভিত্তিক, উপযুক্ত শিখন সামগ্রীর মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া বাস্তবসম্মত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অল্পসময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী বাস্তবসম্মত অনেকগুলো বিষয়ও শিখতে পারে। জীবন্ত ও নাটকীয় উপস্থাপন আনন্দঘন পরিবেশ ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করে বলে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার মাত্রা গভীর ও প্রসারিত হয়।

The Cone of Learning

sparkinsight.com



বিশিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানী Edgar Dale দেখিয়েছেন কীভাবে বিমূর্ত থেকে মূর্ত করতে শিখন শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ সহায়তা করে থাকে। তিনি গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখিয়েছেন ১০% এর কম শুধু বক্তৃতাতে শিখন হয়। অডিও ভিজুয়াল এর মাধ্যমে ২০% এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে ৩০% শিখন সফল হয়। আবার শ্রবণ-দর্শনের সমন্বয়ে শিখন হয় ৫০%, শিখনে বলার সুযোগ থাকলে ৭০% শিখন হয়ে যায়। তবে শিখন সবচেয়ে বেশি স্থায়ী হয় শিক্ষার্থীরা বলার সাথে সেটি অনুশীলন করার সুযোগ পেলে। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস এর উক্তি, Tell me and I'll forget; show me and I may remember; Involve me and I'll understand. প্রবাদ অনুযায়ী বক্তৃতার মাধ্যমে শিখন শিক্ষার্থী ভুলে যেতে পারে। কিন্তু কোনো উপকরণের মাধ্যমে শেখানো হলে তা স্মরণ থাকে এবং তার বুঝতে সহজ হয়।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। উপকরণ ব্যবহারের ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় নিচে তার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো—

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা

- সহজবোধ্যতা : শিখন-শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন কঠিন ও জটিল বিষয়বস্তু সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা যায়। ফলে বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্যতা হ্রাস পায়। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে উঠে।

- **মনোযোগ ও আত্মসৃষ্টি** : বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা যায়। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করতে পারলে শিক্ষাদান কার্যক্রম সার্থক হয় এবং শিক্ষার্থীরা বেশি দিন মনেও রাখতে পারে।
- **প্রেমের সৃষ্টি** : আধুনিক শিখন শেখানো কার্যক্রম মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেন্দ্রিক, মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে রয়েছে শ্রেণিতে প্রেমের সৃষ্টি এবং তা ধরে রাখা। উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের প্রেমের সৃষ্টি হয় ফলে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সহজতর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- **ইন্দ্রিয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার** : বস্তু বা আলোচনা শিক্ষার্থীর সকল ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও সামগ্রী ব্যবহার করলে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর অধিকাংশ ইন্দ্রিয়কে সচল করা যায়। ফলে শিখন সফল হয়।
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়ী** : ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে আলোচনার সাথে সাথে নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবমুখী করা যায়। অনেক সময় যা বর্ণনা করতে অনেক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয় তা একটি ছবি বা ভিডিও ক্লিপ দিয়ে সহজেই বোঝানো যায়। একটি প্রবাদ আছে ‘একটি ছবি হাজার কথার থেকেও বেশি কার্যকর’। বর্ণনামূলক বা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণের চেয়ে উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষণে সময় কম লাগে, শ্রম সাশ্রয়ী হয়।
- **ব্যক্তিগততত্ত্ব নীতির প্রয়োগ** : বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে শিখনে পছন্দ করে। তাছাড়া সকল শিক্ষার্থীর মনোস্তাত্ত্বিক গঠন এক নয়। শিক্ষা বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড গার্ডনার এর মতে, এক এক শিক্ষার্থী এক একভাবে শিখনে পছন্দ করে। শিক্ষার্থীদের এই সব কথা মাথায় রেখে সবাইকে একই কাতারে নিয়ে আসতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করলে শিক্ষণ কার্যকর হয়। অতিমেধাবী, মধ্য ও নিম্নমেধাবী সকলের ক্ষেত্রেই উপকরণ ব্যবহার অধিক কার্যকর।
- **শিখনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি** : উপকরণ ব্যবহার করলে শিখনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের একঘেষেমী দূর হয়।
- **পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে** : উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনাকালে শিক্ষার্থীরা উপকরণসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এতে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করার ক্ষমতাও বেড়ে যায়।
- **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন** : তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে সাথে বাস্তবে শিক্ষার্থী যখন দেখে তখন তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
- **মূর্তকরণ** : মডেল, চার্ট, চিত্র, ভিডিওর ব্যবহার, বিষয়বস্তুকে বিমূর্ত থেকে মূর্ত করে তোলে। ফলে শিখন অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা/ব্যবহারিক জ্ঞান** : তত্ত্বগত জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান ফলপ্রসূ। উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক ও বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয় যার ফলে শিক্ষার্থী বাস্তবজীবনে তা ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষণ উপকরণ ও শিখন-শেখানো সামগ্রী

ব্যবসায় উদ্যোগ বা যে কোনো বিষয়পাঠদানের ক্ষেত্রে যে সকল শিখন সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিম্নরূপভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ উপকরণ ও শিখন শেখানো সামগ্রী						
শিক্ষণ উপকরণ		শিখন-শেখানো সামগ্রী				
অযান্ত্রিক উপকরণ:	যান্ত্রিক উপকরণ:	মৌলিক সামগ্রী:	সহায়ক সামগ্রী			অকারিগরি বা গতানুগতিক সামগ্রী:
লেখার বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড	কম্পিউটার, টেপ রেকর্ডার, ভিডিও, টেলিভিশন	পাঠ্যপুস্তক, সম্পূরক পুস্তক	দৃষ্টিনির্ভর	শ্রুতিনির্ভর	শ্রবণ-দর্শন নির্ভর	বাস্তব উপকরণ, ছবি, পুতুল, ফ্লাশ বোর্ড, চার্ট, সারণি, মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি।
			১। স্লাইডস, ফিল্মক্লিপ, ছবি	২। অডিও, টেপ-রেকর্ডার	৩। টেলিভিশন, প্রামাণ্যচিত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি	

শ্রেণি কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ-উপকরণ ও শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। শিক্ষণ উপকরণ অযান্ত্রিক ও যান্ত্রিক দুধরনের হতে পারে। আর শিখন শেখানো সামগ্রীর কিছু রয়েছে মৌলিক আর অন্যগুলো সহায়ক সামগ্রী। তাছাড়া কিছু গতানুগতিক সামগ্রী ও রয়েছে। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের সুষ্ঠু ও কার্যকরী শিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের উপকরণের বা শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত এ সামগ্রী বা উপকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ (Visual Teaching Learning Materials) : দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- বাস্তব উপকরণ, মডেল, চার্ট, সারণি, ছবি, মানচিত্র, নকশা, পোস্টার, ফ্লাশ কার্ড, ফ্লানেল বোর্ড, ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া, স্লাইডস ইত্যাদি।

২। শ্রুতি নির্ভর উপকরণ (Audio) : রেডিও, সিডি-ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি।

৩। শ্রবণ-দর্শন নির্ভর উপকরণ (Audio-Visual Aids) : শ্রবণ-দর্শন নির্ভর উপকরণ নানা ধরনের হতে পারে। যেমন- কম্পিউটার, টিভি, সিডি-ডিভিডি, সিডি রম, মাল্টিমিডিয়া, চলচিত্র, ডকুমেন্টারি, স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট ডিভাইস ইত্যাদি।

কাজ :

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহৃত দৃষ্টি নির্ভর, শ্রুতিনির্ভর ও শ্রবণ-দর্শন নির্ভর উপকরণের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

পাঠ: ৩.২ দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

সহজলভ্য ও স্থানীয়ভাবে তৈরিয়োগ্য উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষার্থীর শিখন যেমন সহজ হয় তেমনি প্রয়োজনে এমন কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় যা দুর্লভ আবার কিছু কিছু রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। শিখনের গুরুত্ব বিবেচনায় দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এগুলোর ব্যবস্থাপনা জমা ও সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণ

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন সহায়ক সামগ্রীর কিছু কিছু ছবি ও মডেল রয়েছে যা খুবই দুর্লভ। শ্রেণিকক্ষে সচারচর প্রদর্শন বা ব্যবহার করা যায় না আবার মাল্টিমিডিয়া ভিডিও রেকর্ডার রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণিতে এগুলো ব্যবহার করা যায়।

শিখন-শেখানো সামগ্রী সংগ্রহ ও উন্নয়ন

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণের ক্ষেত্রেও শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সংগ্রহ ও উন্নয়ন বা তৈরি এবং ব্যবহার করতে হয়। এ সকল শিক্ষা উপকরণ কখনও স্বল্পমূল্যের কখনও বিনামূল্যের হয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও দুর্লভ বা স্বল্প সরবরাহকৃত হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট পাঠের জন্য এমনভাবে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে হবে যাতে তা শিক্ষার্থীদের শিখনে যথেষ্ট সহায়তা করে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো শিখনফল অর্জনের জন্য কোনো উপকরণটি যথোপযুক্ত হবে তা শিক্ষকই নির্ধারণ করবেন। কিছুতেই অপ্রাসঙ্গিক উপকরণ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তদুপরি এসব উপকরণের প্রাপ্যতা সম্পর্কেও শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি খেয়াল রেখে শ্রেণিতে অতিরিক্ত শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হতে পারে। এ সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের সংগ্রহ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা দরকার সেগুলো হলো :

- শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা;
- উপকরণের উপাদানগুলোর সহজলভ্যতা;
- উপকরণটি শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক কিনা;

- উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহারযোগ্যতা;
- স্বল্পমূল্যে ও স্বল্প সময়ে তৈরিরযোগ্য কিনা;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ও শ্রেয়াদানের ক্ষমতা আছে কিনা;
- উপকরণের যথার্থতা;
- বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়তা;
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহায়ক কিনা;
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন তা বিবেচনা (high, mediocre, low);
- উপকরণের সংরক্ষণযোগ্যতা;
- এমন উপকরণ ধর্ম, বর্ণ, ও ভাষা যা সংস্কৃতিতে যাতে আঘাত না করে।

উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

ব্যবস্থাপনা

শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রাণবন্ত, বিষয়বস্তুর শিক্ষার্থীর কাছে সহজ ও মূর্ত করে তোলা। শিক্ষা উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহার করলেই সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। পুরোপুরি উদ্দেশ্য অর্জনে উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার ও এর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

শ্রেণিকক্ষে সংগৃহীত বা উন্নয়নকৃত উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। উপকরণ যতই মূল্যবাহীন, স্বল্পমূল্যের, স্বল্প সরবরাহকৃত বা দুর্লভ হোক না কেন সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না করলে তা নষ্ট হয়ে অকার্যকর হয়ে যাবে। উপকরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিচের দিকগুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন—

- ব্যবহারের পূর্বে ও পরে নির্ধারিত স্থানে বা কক্ষে উপকরণের প্রকৃতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা;
- উপকরণ সংরক্ষণের কক্ষ বা স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে;
- শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের কক্ষে সকলের অবাধ চলাচল বন্ধ করে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা-বিশেষ করে দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে;
- পচনশীল, ভঙ্গুর উপকরণের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বাঁশ, বেত বা কাঠের তৈরি উপকরণ যাতে পোকায় নষ্ট করতে না পারে সেজন্য কীটনাশকের ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন উপকরণের নাম ও কোন অধ্যায় সংশ্লিষ্ট তা লিখে রাখা ভালো।

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন সংগ্রহ ও উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে শিক্ষককে নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, উন্নয়ন ও ব্যবহার করতে হয়। এ সকল উপকরণ কখনও মূল্যবাহীন বা বিনামূল্যের, কখনও স্বল্পমূল্যের কখনও বা দুর্লভ বা স্বল্প সরবরাহকৃত হতে পারে। যে কোনো ধরনের শিক্ষা উপকরণই হোক না কেন তা সংগ্রহ বা উন্নয়ন যাই করা হোক না কেন সেক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় লক্ষ রাখা দরকার। শিক্ষা উপকরণের দৃশ্যমানতা বা দৃশ্যগত রূপ যেমন থাকতে হবে তেমনি তা যেন ঐ বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্বকারী এবং শিখনে সহায়তা করে।

উপকরণ ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শিখন প্রক্রিয়াকে প্রাণবন্ত করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর শিক্ষার্থীর কাছে সহজ ও মূর্ত করে তোলা। পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জনে এ উপকরণের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে শিখনকে সহায়তা করতেই উপকরণ, নিছক শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনের জন্য শিক্ষাদান নয়।

পাঠ ৩.৩ : মূল্যবিহীন ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ যে ধরনেরই হোক না কেন তা শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে বা ক্রয় করতে হয়। কখনও কখনও শিক্ষক এগুলো নিজে তৈরি বা সংগ্রহ করেন। কিছু কিছু উপকরণ রয়েছে দুর্লভ যা সচারচর পাওয়া যায় না, আবার কিছু কিছু আছে দামি বা মূল্যবান। এগুলোর কিছু কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রয় করে থাকে আবার কিছু কিছু উপকরণ আছে যা সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত না হয়ে স্বল্প সরবরাহকৃত হতে পারে। সম্পূরক পাঠ সহায়ক পুস্তক ও অন্যান্য উপকরণ ইন্টারনেটসহ অন্যান্য মাধ্যমেও সহজপ্রাপ্য। বাস্তব উপকরণ, ছবি, চার্ট, মুদ্রিত উপকরণ এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সংগ্রহ করতে হয় অনেক সময় এর জন্য অর্থ খরচ করতে হয় না অর্থাৎ বিনামূল্যে বা মূল্যবিহীন উপকরণ, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করতে হয়। মূল্যবিহীন বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ যাই হোক না কেন শিক্ষার্থীরা এগুলো দেখে বা ব্যবহার করে দীর্ঘস্থায়ী শিখন অর্জনে সক্ষম হয়। স্বল্প সরবরাহকৃত কম্পিউটার বা মাল্টিমিডিয়া, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, টেপেরেকর্ডার, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি এগুলো প্রতিষ্ঠানে সরকার প্রদান করে আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান নিজেই সংস্থান করে। এগুলো No cost বা Low cost উপকরণের মধ্যে পড়ে না। যে কোনো ধরনের উপকরণই হোক না কেন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কোনো একটি নির্দিষ্ট পাঠের জন্য এমনভাবে সহায়ক উপকরণ নির্বাচন ও উন্নয়ন করতে হবে যাতে তা শিক্ষার্থীর শিখনে পর্যাপ্ত সহায়তা করে।

পাঠ ৩.৪ : অন্যান্য সামগ্রী

পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্যপুস্তক হলো শিক্ষাক্রমের বাহন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য স্তর ও শ্রেণিভিত্তিক রচিত বইপত্র হলো পাঠ্যপুস্তক।

সম্পূরক পাঠ সামগ্রী (Supplementary Reading Materials-SRM)

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো শিক্ষার্থীর আরো জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সমান্তরালে যে সামগ্রী ব্যবহার করা হয় তা বিষয়ের জ্ঞানকে পূর্ণতা দান করে। এ সমস্ত পাঠ্যসামগ্রীর কারণে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ও ব্যাপকতা বেড়ে যায়, তাছাড়া তাদের পাঠ্যভ্যাসও গড়ে ওঠে। পরবর্তী পাঠের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সমান্তরালে যে সামগ্রীগুলো ব্যবহার করে শিক্ষক ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আনার প্রচেষ্টা করেন সেগুলোকে সম্পূরক নির্দেশনা সামগ্রী বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো দক্ষতা অর্জনের জন্যও এটি ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া শিক্ষক নির্দেশিকা, অনলাইন রিসোর্স ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের কাজে প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী হলো ব্যবসায় উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তক। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এ পাঠ্যপুস্তক সহায়ক হিসাবে কাজ করে। এ বিষয়ের শিখনফল অর্জনে পাঠ্যপুস্তক প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আইসিটি সামগ্রী (DVD, TV Internet)

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। কম্পিউটার এবং এ সম্পর্কিত প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ও শিক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে। আমাদের বিদ্যালয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তথ্য ও আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত উপকরণ সরকার পৌছে দিয়েছে। তথ্যের সহজলভ্যতা আইসিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি শিক্ষকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। ICT-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো যোগাযোগ। আইসিটি ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নবতর ও আকর্ষণীয় হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় উদ্যোগে প্রত্যাশিত তথ্য ও ধারণা প্রদান সহজতর হয়।

এই বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার গতানুগতিক পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয়েছে। শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন

অ্যানিমেটেড চিত্র, অডিও, ভিডিও ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেট ও ই-লার্নিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি ও জ্ঞান শেয়ার করতে পারছে, বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষার্থী অনলাইনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিজের যোগ্যতা যাচাই করতে পারছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন অবশ্য শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে শিক্ষাক্ষেত্রে গণমুখী করার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমেডিয়া ক্লাসরুম, উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করছে যা শিক্ষার মানকে আরো উন্নত করছে। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষণেও এগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে। নবম ও দশম শ্রেণির ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে অধ্যায় অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য উপকরণের তালিকা নিম্নে দেখানো হলো।

অধ্যায়ের নাম	স্থানীয়ভাবে সংগ্রহযোগ্য/ক্রয়	শিক্ষক কর্তৃক তৈরি
১ম অধ্যায়- ব্যবসায় পরিচিতি	নাসরীর জন্য চারাগাছ, ভোগ্য পণ্য, কড়ি, পাথর, ধাতবমুদ্রা, শামুক, ঝিনুক, চিনামাটির সামগ্রী।	ফুলদানি, ঠোঙ্গা, খেলনা দ্রব্য, চার্ট, মডেল, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প কলকারখানা, নার্সিং হোম, দর্শনীয় স্থানের ছবি, ভিডিও চিত্র, ছবি সম্বলিত পোস্টার (পাঠসংশ্লিষ্ট)।
২য় অধ্যায়- ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা	হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, শিল্পজাতপণ্য, মৃৎশিল্পের পণ্য।	খ্যাতিমান উদ্যোক্তার ছবি, সংক্ষিপ্ত জীবনী, চার্ট, মডেল, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ছবি, ভিডিও চিত্র, ছবি সম্বলিত পোস্টার (পাঠসংশ্লিষ্ট)।
৩য় অধ্যায়- আত্মকর্মসংস্থান	নকশিকাঁথা, খেলনাসামগ্রী, মৃৎশিল্প, মোমের তৈরিপণ্য, টুথপিক, চকলেট, চিপস, মধু, পেনসিল, রাবার, কটনবাড, ফটোফ্রেম, চারাগাছ, নকশি করা ড্রেস, হস্তশিল্পের পণ্য ইত্যাদি।	কাগজবা বোর্ডের তৈরি খেলনাসামগ্রী, ফুলদানি, পাটজাত ও বাঁশজাত দ্রব্যাদি, ছবি ও ভিডিওচিত্র- যেমন- মাছচাষ পদ্ধতি, গবাদি পশু, হাঁসমুরগির খামার ও পালন পদ্ধতি, আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ও বিভিন্ন আত্মপ্রত্যায়ী ছবি, বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম, আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণসংক্রান্ত বিভিন্ন শ্লোগান, ব্যানার ইত্যাদি।
৪র্থ অধ্যায়- মালিকানারভিত্তি তব্যবসায়	মুদি দোকানসামগ্রী।	একমালিকানা, কোম্পানি ব্যবসায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়, সমবায় সংগঠন, বিভিন্ন পেশাজীবীদের ছবি ও কর্মপদ্ধতির ভিডিও চিত্র। অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্র, নিবন্ধনপত্র, বিবরণপত্র, স্মারকলিপি, পরিমেল নিয়মাবলি, শেয়ার ইত্যাদির আবেদন ফরম, ইত্যাদিও নমুনা কপি, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ছবি।
৫ম অধ্যায়- ব্যবসায়েরআইনগ তদিক	নামীদামী ব্র্যান্ডের পণ্য যেমন- পিজ্জাহাট, কে.এফ.সি, বাটা সু কোম্পানির পণ্য, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক সংবলিত ঔষধ, তেল, সাবান, লোসন ইত্যাদি।	পেটেন্ট, ট্রেডমার্কের নমুনা কপি, বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকের বই, শিল্পীর চিত্রকর্ম, গান, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলার ছবি, চার্ট, মডেল, ছবি সংবলিত পোস্টার (পাঠসংশ্লিষ্ট)
৬ষ্ঠ অধ্যায়- ব্যবসায় পরিকল্পনা	চার্ট, মডেল, ছবি সম্বলিত পোস্টার (পাঠসংশ্লিষ্ট)। পত্রিকার কাটিং।	নবগঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ছবি ও কর্মপদ্ধতির ভিডিও চিত্র, বড় ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ছবি।
৭ম অধ্যায়- বাংলাদেশের শিল্প	পাট, বস্ত্র, চামড়া শিল্পজাত পণ্য, চায়ের ট্রে, কুলা, চালুন, মোমবাতি, খেলনা ইত্যাদি।	শোপিস, জামদানি, স্কুলব্যাগ, ফুলের টব, ঝুড়ি, টেবিল ক্রুথ, কনফেকশনারি, হাসপাতাল, ক্লিনিক, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, পরিবহনের ছবি ও ভিডিও, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিডিও চিত্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মডেল।
৮ম অধ্যায়- ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ছবি।	চার্ট, মডেল, ছবি সংবলিত পোস্টার (পাঠসংশ্লিষ্ট), আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছবি, বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের ভিডিও চিত্র, নামী-দামী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছবি
৯ম অধ্যায় বিপণন	ক্রেতা ও বিক্রেতার ছবি, মোড়কজাত ও শিল্পজাত পণ্য, বিজ্ঞাপনের কাটিং, পেপার কাটিং, বিলবোর্ডের ছবি।	চার্ট, মডেল, ছবি সংবলিত পোস্টার (পাঠসংশ্লিষ্ট), বিজ্ঞাপনের ভিডিও, বিজ্ঞাপন ও বিলবোর্ডের মডেল।

অধ্যায়ের নাম	স্থানীয়ভাবে সংগ্রহযোগ্য/ক্রয়	শিক্ষক কর্তৃক তৈরি
১০ম অধ্যায়- ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক সেবা	সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পজাত পণ্য।	ব্যবসায় উদ্যোগে সহায়তা দানকারী যে কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন- যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এনজিও যেমন- প্রশিকা, মাইডাস ইত্যাদির ছবি ও কাজের প্রকৃতির ভিডিও চিত্র।
১১শ অধ্যায়- ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব	পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন ধরনের ছবি যেমন- শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ক্লিনিক ও হাসপাতালের ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি এবং এ সংক্রান্ত পেপার কাটিং।	পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন ধরনের ছবি, ভিডিও। এর ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রভাব সংবলিত ভিডিও চিত্র। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ছবি, তাদের কাজের প্রকৃতির ভিডিও চিত্র, তাদের তৈরিকৃত পণ্য এবং তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।
১২শ অধ্যায়- সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয়	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পণ্য যেমন- পুতির মালা, মুক্তার মালা, তামা, কাসার পণ্য, গহনা, ভ্যানিটি ব্যাগ, নকশা করা টুপি, মাফলার ইত্যাদি।	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ছবি, তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাদের কাজের ভিডিও চিত্র ও তৈরিকৃত পণ্য, দেশ এবং বিদেশের উল্লেখযোগ্য উদ্যোক্তাদের ছবি, সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ছবি।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে নবম ও দশম শ্রেণির ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের কোনটি স্বল্পমূল্যের এবং কোনটি বিনামূল্যের তা চিহ্নিত করুন।

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শিখন-শেখানো সামগ্রী বলতে কী বুঝায়?
২. দৃষ্টিনির্ভর উপকরণের কয়েকটি উদাহরণ দিন।
৩. দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ক. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
খ. শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
২. ক. দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণ সংরক্ষণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
খ. মূল্যবাহীন ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে কীভাবে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৪ : ব্যবসায় উদ্যোগের পাঠ পরিকল্পনা

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের আগাম সিদ্ধান্ত। কোনো একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কখন, কোথায়, কিভাবে, কাকে দিয়ে, কি উপায়ে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে তার অগ্রীম নকশা প্রণয়নই হলো পরিকল্পনা। শ্রেণি পরিকল্পনা স্বল্প ও দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রণীত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়ে থাকে তাকে বলে পাঠ পরিকল্পনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঠ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনাহীন প্রতিষ্ঠান হালছাড়া নৌকার মতো। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিকল্পনার বিকল্প নেই। এ অধ্যায়ে ব্যবসায় উদ্যোগের পাঠ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে—

৪.১. একক পাঠ পরিকল্পনা

৪.২ একক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

৪.৩ শিখনফল, শিখন কার্যক্রম

৪.৪ শিখন-শেখানো পদ্ধতি কৌশল

৪.৫ পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

৪.৬ দুলভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সনাক্তকরণ ও উন্নয়ন

৪.১ একক পাঠ পরিকল্পনা

আমরা আগেই জেনেছি পাঠ পরিকল্পনা বলতে আমরা কি বুঝি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনার জন্য সুবিন্যস্ত উপায়ে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির আলোকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পাঠদানের জন্য যে রূপরেখা প্রণীত হয় তাকে পাঠ পরিকল্পনা বলে। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির বিষয়কে এক একটি ইউনিটে ভাগ করে ইউনিট অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের জন্য আলাদা আলাদা যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাকে বলে একক পাঠ পরিকল্পনা।

ব্যবসায় উদ্যোগে একক পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব

একজন শিক্ষকের জন্য একক পাঠ পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সহায়ক টুলস হিসেবে কাজ করে থাকে। নিম্নে একক পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হলো।

- সময়ের সদ্যবহার করা সম্ভব হয়;
- পাঠের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়;
- পাঠদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়;
- পাঠদানের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়;
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়;
- শিক্ষকের মনোবল বৃদ্ধি পায়;
- পাঠদানে গতিশীলতা বজায় থাকে;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ

একটি ফলপ্রসূ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কার্যকর উপাদানের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। অন্যথায় পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ হলো— ১। প্রস্তুতি ২। উপস্থাপন ৩। প্রয়োগ।

প্রস্তুতি : পাঠ পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হলো প্রস্তুতি। শ্রেণিতে পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিবেন। পূর্ব প্রস্তুতির লক্ষ্যে শিক্ষকের শারীরিক, মানসিক ও বস্তুগত প্রস্তুতি অবশ্যই থাকতে হবে। মূল পাঠে প্রবেশের আগে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যা যা করবেন তা বিধৃত হবে প্রস্তুতি পর্বে। প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন শিক্ষক।

উপস্থাপন : পাঠ ঘোষণার পর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠটি শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে করণীয় কাজগুলো করে থাকেন। এখানেও শিক্ষক প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রয়োগ : পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রয়োগ। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োগ পর্বটি চলবে। এখানে শিক্ষক সারাংশ, পাঠের পুনরাবৃত্তি, পুনঃমূল্যায়ন, বাড়ির কাজ প্রদান, পাঠদান সমাপন সকল কাজ কিভাবে করবেন প্রয়োগ অংশে তা উল্লেখ থাকে। কিভাবে করবেন তার পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষক তা নির্ধারণ করবেন। সবশেষে আমরা বলতে পারি শিক্ষক উপরোক্ত উপাদানগুলির যথার্থ সমন্বয় করত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন যাতে করে একটি আদর্শ ও ফলপ্রসূ পাঠদান করা সম্ভব হয়।

৪.২ একক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

প্রতিষ্ঠানের নাম : ক শ্রেণি : ৯ম-১০ম শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ০০০ শিক্ষকের নাম : খ	বিষয় : ব্যবসায় শিক্ষা (ব্যবসায় উদ্যোগ) অধ্যায় : ৬ষ্ঠ সময় : ৫০ মিনিট তারিখ :
উপকরণ	কম্পিউটার/ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, পেনড্রাইভ/মোবাইল/ক্যামেরা, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, পেপার, মার্কার, সাইনপেন, পাঠ্যবই।
পদ্ধতি ও কৌশল	ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন, কেস স্টাডি প্রদর্শন সংক্ষিপ্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ।
স্বাগতম 	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে তোমার স্কুলের সহকারী শিক্ষক, শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পৃক্ত করে উদ্‌যাপন কমিটি করেন। সব ধরনের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানটির সফল সমাপ্তি করতে সহকারী শিক্ষকের এই প্রচেষ্টাকে আমরা কী বলবো?
ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রণয়নের প্রক্রিয়া। 	শিখন ফল এই পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা- ১. ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে। ৩. ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
	একক কাজ সময় : ৫ মিনিট ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায় লিখ?
সমাধান পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের আগাম সিদ্ধান্ত। ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। ব্যবসায়ের কোনটি কখন, কোথায়, কিভাবে কতটুকু সাফল্য করা যাবে তার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনাই হলো ব্যবসায় পরিকল্পনা। 	
জোড়ায় কাজ সময় : ৮ মিনিট উদ্দীপক হতে ব্যবসায় পরিকল্পনার ৫টি	সমাধান সময় : ৫ মিনিট ১. ব্যবসায় পরিচালনা দিকনির্দেশনা। ২. মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ। ৩. সরকারি সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার।

গুরুত্ব উল্লেখ কর।	৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা। ৫. লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। ৬. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হ্রাস। ৭. প্রতিযোগিতা মোকাবিলা। ৮. সম্পদের সঠিক ব্যবহার। ৯. দক্ষতা বৃদ্ধি। ১০. ভবিষ্যৎ অনুমান।
দলগত কাজ সময় : ১২ মিনিট একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে কী কী কাজ করতে হয় বলে তোমরা মনে কর? তা খাতায় লিখ।	সমাধান সময় : ৮ মিনিট ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায় কার্যাবলির আগাম নকশা। এটি একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়। তা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো। ➤ ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়ন। ➤ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা। ➤ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। ➤ পরিকল্পনা আঙ্গিনা নির্ধারণ। ➤ বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন। ➤ বিকল্প পরিকল্পনাসমূহ মূল্যায়ন। ➤ সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ। ➤ কাজের সময় নির্ধারণ। ➤ বাজেট বরাদ্দ করা। ➤ পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রয়োগ।
মূল্যায়ন সময় : ৭ মিনিট ১. ব্যবসায় কাজিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তামূলক কাজকে কী বলে? ২. ব্যবসায় পরিকল্পনার একটি প্রধান গুরুত্ব বল। ৩. বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন কোন কাজের অংশ?	বাড়ির কাজ সময় : ৫ মিনিট ধানসিঁড়ি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপনের পূর্বে জনাব তাহমিন কতকগুলো অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি সফলতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ধানসিঁড়ি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হওয়ার পিছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে লিখে আনবে।
	

সেসিপ-এনসিটিবি নির্ধারিত একক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

পাঠ : ব্যবসায়ের ধারণা ও উৎপত্তি

সময় : ৫০ মিনিট

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
১. ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নিম্নোক্ত জীবন অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করব। - অভাব পূরণের জন্য মানুষ কী কী কাজ করে? - তোমাদের পরিবারগুলো কী কী উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে? ✓ আইসক্রিম বিক্রি, মাছ বিক্রি, ঔষধ বিক্রি কোন্ ধরনের জীবিকার উপায়? শিক্ষার্থীদের উত্তরের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে ব্যবসায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ১০ মি:	শিক্ষার্থীদের ধারণা মূল্যায়ন করে ফিডব্যাক প্রদান এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন	পোস্টার পেপারে বিভিন্ন ব্যবসায়ের ছবি/মাল্টিমিডিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের ভিডিও

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
২. ব্যবসায়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	জীবন অভিজ্ঞতাভিত্তিক কাজ : ✓ দলগতভাবে আশে-পাশে দৃশ্যমান বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের তালিকা করতে বলব। ✓ প্রত্যেক দলকে তাদের প্রদত্ত কাজ উপস্থাপন করতে বলব। ✓ তালিকা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যবসায় বা জীবিকার উপায়গুলোকে প্রাচীন ও আধুনিক অনুসারে সাজাতে বলব। ✓ বিভিন্ন প্রকার প্রাচীন মুদ্রার ছবি বা সংগৃহীত মুদ্রা প্রদর্শন। ২০ মি:	➤ প্রাচীনকালে কীভাবে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত? ➤ কাগজি মুদ্রার চালুর আগে কীভাবে দ্রব্যসামগ্রি ক্রয়-বিক্রয় হত? ➤ চালের পরিবর্তে মাছ সংগ্রহের নিয়মকে প্রাচীনকালে কী বলা হতো?	বিভিন্ন প্রকার প্রাচীন মুদ্রার ছবি বা বাস্তব সংগৃহীত মুদ্রা প্রদর্শন
৩. ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবে।	জীবন অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন-উত্তর: ● আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় কোনগুলো? ✓ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে শামুক, বিনুক, কড়ি, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা কোন যুগে ব্যবহৃত হত? ✓ কাগজি মুদ্রার প্রচলন কোন যুগে হয়েছিল? ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলোকে বিশ্লেষণ করে নতুন ও ধারণা ও ব্যাখ্যা প্রদান। ২০ মি:	চিন্তনমূলক প্রশ্ন ➤ দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা কী ছিল? ➤ মোবাইল ব্যাংকিং প্রচলন কীভাবে আধুনিক ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে?	
পাঠের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়	আত্ম প্রতিফলন/মূল্যায়ন: ✓ আজকের পাঠটি কতটুকু সফল হয়েছে? ✓ আর কী করলে ক্লাসটি আরো ফলপ্রসূ হতো?		

৪.৩ শিখন ফল ও শিখন কার্যক্রম

আমরা জানি, শিখন হলো আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন। অর্থাৎ পাঠদান শেষে শিক্ষার্থী ঐ পাঠ হতে কি কি পারিদর্শিতা অর্জন করতে পারবে আচরণিক পরিভাষায় তার বর্ণনা। শিক্ষক পাঠদানের পূর্বেই নির্দিষ্ট পাঠের শিখনফল সুনির্দিষ্ট করেন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়েছে কিনা যাচাই করেন। According to Solomon Ortiz "Education is the key to success in life and teachers make a lasting impact in the lives of their students". অর্থাৎ শিখনফল হলো ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা হতে নবতর দক্ষতা অর্জন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর তা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আমাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের যে সুসৃজ্ঞলরূপ তা শিখনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণের শিখনফল বলতে ব্যবসা উদ্যোগ অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীগণ ব্যবসা উদ্যোগ সংক্রান্ত যে দক্ষতা অর্জন করবে তাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে ব্যবসা শিক্ষা শাখায় মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসা উদ্যোগ বিষয়ের শিখন ফলকে বোঝাবে। শিক্ষক যে পাঠ দিবেন তার অন্তর্নিহিত বিষয়ের ওপর শিখনফল চিহ্নিত করবেন। পাঠ-পরিকল্পনার যে শিখনফল নির্ধারিত থাকবে তা নির্দিষ্ট পাঠ শেষে অর্জিত হল কিনা পাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিখনফল দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো নির্দিষ্ট পাঠে পাঠের ব্যাপ্তি অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। শিখনফল অবশ্যই ক্রিয়ামূলক ও পরিমাপযোগ্য হবে। শিক্ষার্থী হাতে কলমে, ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে শিখবে, বলতে পারবে, সনাক্ত করতে পারবে। অংকন, তুলনা করতে পারবে। অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলকভাবে পাঠ গ্রহণ করবে। পাঠ পরিকল্পনা মোতাবেক শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠদান করবেন। সেক্ষেত্রে তার পূর্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। শিখনফল পূর্ব নির্ধারিত থাকবে। শিখনফল অর্জনের জন্য তিনি ধাপে ধাপে তার শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী আইসিটি'র সহায়তা নিয়ে শিক্ষক তার শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

উপসংহারে বলা যায়, শিখনফল অর্জনে পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করে যথাযথ মূল্যায়ন করে শিখন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে আন্তরিক, শিক্ষার্থীবান্ধব ও তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে।

কার্যকর পাঠ পরিকল্পনার পূর্বশর্তসমূহ

একটি পাঠ পরিকল্পনা তখনই কার্যকর হবে যদি তার ভিতর সুনির্দিষ্ট কতিপয় শর্তগুলো সন্নিবেশিত থাকে। নিম্নে কার্যকর পাঠ পরিকল্পনার শর্তগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো:

বিষয়বস্তুর সুনির্দিষ্টতা : পাঠ পরিকল্পনার অন্যতম পূর্বশর্ত বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট করা। কোন বিষয়বস্তুর কোন পাঠ পড়ানো হবে তার উপর ভিত্তি করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা।

পাঠের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ : যে বিষয়ে পাঠদান করা হবে তার উদ্দেশ্য স্থিরকরণ অর্থাৎ শিখনফল কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

পাঠপর্ব বিভক্তকরণ : শ্রেণিতে পাঠদানকালে পাঠকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে নিতে হবে। কোন পর্বে কী কী কাজ করতে হবে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

সময় নির্ধারণ : প্রতিটি পর্বে সময় বিভাজন করা পাঠ পরিকল্পনার অন্যতম পূর্বশর্ত। দক্ষ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যথাযথ সময় জ্ঞান। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। এই কারণে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কোন পর্বে কতটুকু সময় বিভাজন প্রয়োজন তার উল্লেখ থাকবে।

সহজ হতে কঠিনে প্রবেশ : পাঠ পরিকল্পনার অন্যতম শর্ত হলো শিক্ষার্থীকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সহজ হতে কঠিন - এ নিয়মে শিক্ষককে পাঠদান করতে হবে। এতে করে আনন্দের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠ আয়ত্ত করবে, পাশাপাশি শিক্ষকের পাঠদান কার্যকর হবে।

পাঠ বিশ্লেষণ : পাঠ পরিকল্পনার অন্যতম শর্ত হলো পাঠ বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পাঠ বিভিন্ন অংশে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে পাঠদান সমাপ্ত করতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের একঘোঁয়েমী দূর হবে। বিষয় বুঝতে তাদের সহজ হবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ স্পষ্টীকরণ : শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর কাজ কী হবে তার স্পষ্টতা উল্লেখ থাকবে। এটি পাঠ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য পূর্বশর্ত। উপসংহারে আমরা বলব, একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় উপরোক্ত শর্তগুলো অবশ্যই থাকতে হবে।

8.8 ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশল

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এই চলমান প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে শিক্ষকের বিকল্প নেই। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তার পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করে থাকেন। যে কারণে শিক্ষক কখনো কৌশলকে পদ্ধতি, আবার পদ্ধতিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ব্যবসা শিক্ষা শিক্ষণ বিষয়ে পাঠদানকালে শিক্ষক পাঠের শিখনফল অর্জনের নিমিত্তে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকেন। কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহারে শিক্ষক পাঠদান করেন না, বরং শ্রেণিকক্ষে যখন কোনো পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করতে হবে বা কোনো উপায়ে পাঠদান ফলপ্রসূ হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের দক্ষতার উপর। আগে শিক্ষক ক্লাস নিতেন যেখানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল নিক্রিয়। আধুনিক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান জনপ্রিয়। এর অবশ্যই ভালো দিক রয়েছে। আমরা দেখি একজন শিক্ষক ফলপ্রসূ পাঠদান লক্ষ্যে নানা পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে থাকেন। নিম্নে সেগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো।

আবিষ্কার পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীকে সরাসরি তথ্য না বলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা হতে সেগুলো আবিষ্কারের জন্য সহায়তা করা হয়। অর্থাৎ তথ্যের উৎস, ব্যবহার, সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করত যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মাঝে আন্তরিক কৌতূহল সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থী আগ্রহী হয়ে আন্তরিকতা দিয়ে এ কাজটি করবে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন যাতে শিক্ষার্থী আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে।

প্রকল্প পদ্ধতি

শিক্ষা হলো জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক কাজে লাগিয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমাধানের মাধ্যমেই সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে শিখনফল অর্জনের পন্থাই হলো প্রকল্প পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে শিক্ষক হবেন পথ প্রদর্শক। সকল শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি পক্ষপাতমুক্ত থাকবেন।

প্যানেল আলোচনা

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো প্যানেল আলোচনা। এক্ষেত্রে শিক্ষক পূর্ব হতেই প্যানেলভুক্ত ৪ থেকে ৭জন শিক্ষার্থীকে আলোচনার বিষয়বস্তু জানিয়ে দেন, যাতে তারা পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারে। বাকী শিক্ষার্থীরাও বিষয়বস্তু জানবে। প্যানেলে দলনেতা নির্বাচন করা হয়। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দিকে শিক্ষক তত্ত্বাবধান করবেন। সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষক অথবা নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি। শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে মূল বিষয় উপস্থাপন করবেন। বিভিন্ন আলোচনা থেকে সমস্যার সমাধান ও একটি সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে। এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শ্রোতার আসনে থাকে। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নোট রাখে। প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারে, সবশেষে আলোচনার সার-সংক্ষেপ হাউসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তুলে ধরেন।

প্রদর্শন পদ্ধতি

একটি ফলপ্রসূ শিখন শেখানো পদ্ধতি হলো প্রদর্শন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাঠের মূল বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে পাঠদান করে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থী সহজেই বিষয়টিকে আয়ত্ত করতে পারে। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদর্শন পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এতে করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হয়। শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে পাঠদান করে থাকেন।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

শিক্ষার্থীর মানসিক ও আচরণভিত্তিক অবস্থা প্রত্যক্ষণ করার অন্যতম পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এতে করে শিক্ষার্থী যা মুখে হয়তো প্রকাশ করতে জড়তা কাজ করে কিন্তু স্বচক্ষে দেখে তার মানসপটে স্থায়ী হয়। তখন ঐ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারে। বন্ধ ও মুক্ত এই দু'ভাবেই শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। আমরা শিক্ষার্থীদের আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠ সম্পর্কে অবগত করতে পারি। তাছাড়া ছদ্ম শিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়।

ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয় একটি কার্যকর শিখন শেখানো পদ্ধতি। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থী সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। একক বা দলীয় অভিনয়ের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের চারপাশের বাস্তব জীবনের আলোকে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন- ব্যবসা শিক্ষা শিক্ষণ বিষয়ে ব্যাংক সম্পর্কে আলোচনায় ব্যাংক সম্পর্কিত ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ব্যাংক সম্পর্কে মানসপটে তার চিন্তা কাজ করে থাকে।

বক্তৃতা

বক্তৃতা সনাতন পদ্ধতি। কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক ততটা পাওয়া যায় না। তারা তেমন সাড়া দিতে উৎসাহ বোধ করে না। তবে শিক্ষকের আন্তরিকতায় কখনও কখনও বক্তৃতাও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ব্রেইন স্টর্মিং

শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে ঝড় তোলেন কোনো ইস্যু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সবার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিবেন। এর উপর চিন্তা করতে বলবেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের কাছ হতে তা জানার চেষ্টা করবেন। সবার মাঝে হতে একটি বিষয়ে ধারণা সংঘবদ্ধ হবে। তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে। এতে করে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সবশেষে শিক্ষক এ বিষয়ের উপর স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

মাইন্ডম্যাপিং

এই কৌশলে শিক্ষার্থীদেরকে ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে আলোচনার জন্য মূল বিষয়টি তাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে তাদের ধারণাকে সংঘবদ্ধ করে। এক্ষেত্রে রেখা, ডায়াগ্রাম এমনভাবে তাদের ধারণাকে সংযোগ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্থায়ী করা হয়।

মার্কেটপ্লেস

একটি সৃজনশীল কৌশল হলো পাঠদানের ক্ষেত্রে মার্কেটপ্লেস। দলগত বা দলীয় কাজ মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষক কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা পোস্টারে দলীয়ভাবে কাজগুলো করবে এবং তা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবে। প্রত্যেক দলের কাজ অন্য দল ঘুরে ঘুরে দেখবে। নতুন কোনো তথ্য থাকলে তা তারা খাতায় নোট করে নেবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সামাজিকতাবোধও তৈরি হয়।

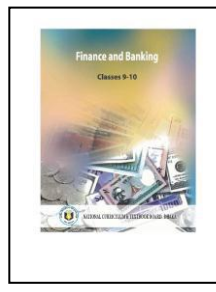
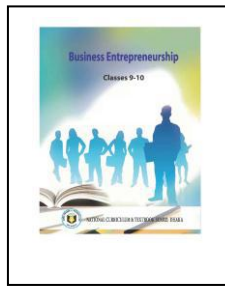
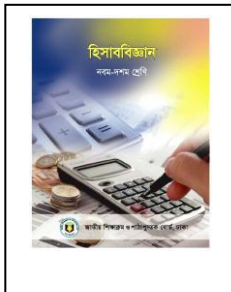
তাছাড়া শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে আরো রয়েছে আলোচনা, শিক্ষা সফর, প্রশ্নোত্তর। এগুলো শিক্ষক পাঠের প্রয়োজন মোতাবেক প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ একটি পাঠকে আকর্ষণীয় ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে শিক্ষক নিজেই সিদ্ধান্ত নেন পদ্ধতি ও কৌশল কোনটি তিনি প্রয়োগ করবেন।

৪.৫ পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। জন্মের পর হতে প্রতিটি মানুষ নানাভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র হতে এই শিক্ষা কার্যক্রম চলমান একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল কিছু এই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আর তাই কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করে আধুনিক শিক্ষাক্রমের উপর। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রধান বিষয়গুলোর অন্যতম হলো পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক একটি অন্যগুলোর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজন শিখন সামগ্রী প্রণয়ন। শিখন কাজকে ত্বরান্বিত করতে শিখন সহায়ক সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। আর তাই শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অন্যতম সহায়ক সামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক নানা ধরনের হতে পারে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক খুবই সতর্কতার সাথে পাঠ্যসূচি মোতাবেক প্রণীত হয়। পাঠ্যভ্যাস তৈরি ও শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ তৈরিতে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, আর তাই বলা হয়। A text book is an important aid for learning. It helps the students to relate what they are learning to life.

পাঠ্যপুস্তক

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক এ তিনের যোগসূত্রে রয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণীত হয় একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা দেশের শিক্ষার্থীদের শারিরীক, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের জন্য। আর সে কাজটি করা হয় পাঠ্যসূচি অনুসারে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের মাধ্যমে According to en.m. Wikipedia. org A textbook is a manual of instruction in any Branch of study although most textbooks are not only published in printed Format, Many are now available as online Electronics books.



সুতরাং আমরা বলতে পারি কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শিক্ষার্থীদের শারিরীক, মানসিক, সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণপূর্বক শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী ও নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য NCTB কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যবই হলো পাঠ্যপুস্তক। আর তাই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজটি খুবই যত্ন ও সতর্কতার সাথে করতে হয়।

পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব

কার্যকর শিখনের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন সামগ্রী হিসাবে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা মাথায় রেখে পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা জরুরি বিধায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ জরুরি বিষয়। পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব নিম্নরূপ-

- শিক্ষার্থীর নিয়মিত পাঠের অভ্যাস গড়তে পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন;
- শ্রেণি পাঠদানকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে;
- পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই পাঠদান চলে;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কতটুকু পাঠদান করবেন তা পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত নেন;
- শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে;
- পাঠ পরিকল্পনার অন্যতম অনুসঙ্গ হল পাঠ্যপুস্তক;
- শিক্ষক পূর্ব হতেই শ্রেণী পাঠদানের জন্য পাঠ্যপুস্তক অনুসরণপূর্বক প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকেন;
- অনেক সময় শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের উপর অধিক নির্ভরশীল হন;
- শিক্ষার্থীর পাশাপাশি অভিভাবকগণও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে সন্তানের লেখাপড়া দেখভাল করেন;
- পাঠ্যপুস্তক প্রশ্ন প্রণয়ন কাজে শিক্ষক ব্যবহার করেন।

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার নিম্নরূপ-

- শিক্ষাদান কাজে শিক্ষক ব্যবহার করেন;
- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কাজে এই পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা হয়;
- উপকরণ তৈরিতে সহায়তা করে। জীবনভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করেন শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে;
- ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানসিক সাহস যোগান। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন গ্রথিত করেন ;
- মূল পাঠ্যবই হিসাবে শিক্ষার্থীদের তা পঠনে উৎসাহিত করেন। শিক্ষার্থীরাও তা অনুসরণ করে থাকে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও শিক্ষাক্রমের যথার্থ প্রয়োগের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসা শিক্ষা শাখার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের একটি হলো ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ। শিক্ষার্থীর নৈতিকতা বোধ, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও কায়িক পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে তাদের গড়ে তুলতে এই পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প নেই।

৪.৬ দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে কার্যকর করার লক্ষ্যে যে সকল সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিখন ও শেখানো উপকরণকেই আমরা শিক্ষা উপকরণ বলে থাকি। শিক্ষা উপকরণ শিক্ষক নিজহাতে তৈরি করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে তৈরি, অথবা সংগ্রহ করতে পারেন। উপকরণ নানা ধরনের হতে পারেন। উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষক মূল বিষয়কে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করেন যা শিক্ষার্থীকে সহজে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি শিখন অস্থায়ী, আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য হয়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে গতিশীল প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক যে সকল সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন তাকে বলা হয় শিক্ষা উপকরণ। ব্রিটিশ অভিধানে বলা হয়েছে 'Material used by a teacher to supplant classroom instruction or to stimulate the interest of students' তাছাড়া শিক্ষার্থীর জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তা দক্ষতার স্ফূরণঘটে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে। শিক্ষা উপকরণ নানা ধরনের হয়ে থাকে, স্বল্পব্যয়ী, দুষ্প্রাপ্য, বিনামূল্যে ও সহজপ্রাপ্য শিক্ষা উপকরণসমূহ শিক্ষক পাঠদানের প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবহার করে থাকেন। ব্যবসায় শিক্ষা পাঠদানকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে উপকরণ যাতে

সময়মতো যথাযথ বিষয়ে যথাযথ উপকরণ ব্যবহারে সচেতন থাকতে হয়। আর তাই তো সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানকালে উপকরণ ব্যবহার প্রদর্শন ও এর উপযোগিতা লাভের সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণই হল উপকরণ ব্যবস্থাপনা। আর এজন্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা কতিপয় অনুসঙ্গের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে এগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো।

শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস

ব্যবসা শিক্ষা বিষয়ে উপকরণ প্রদর্শন ও ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস করতে হবে। উপকরণ যথাযথভাবে প্রদর্শনের জায়গা নির্ধারণ করতে হবে। সকল শিক্ষার্থীর সামনে উপকরণ যাতে দৃশ্যমান হয় তেমন ব্যবস্থা করতে হবে।

আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষ

আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের নিজ নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য মোতাবেক শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করতে হবে। চলাফেরার জন্য জায়গা, আলো বাতাসের পর্যাপ্ততা বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণের উপর উপকরণ ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এমন ব্যবস্থা থাকলে উপকরণ ব্যবহারের সুফল পাওয়া সম্ভব হয়।

যথাযথ উপকরণ ব্যবহার

অবশ্যই শিক্ষককে মনে রাখতে হয় যথাসময়ে যথাযথ বিষয়ে, যথাযথ উপকরণ ব্যবহারের উপর উপকরণ ব্যবস্থাপনা বহুলাংশ নির্ভর করে। আরো মনে রাখতে হবে যে, উপকরণ ব্যবহারের শিক্ষার্থীর কাছে বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলা হয়।

উপস্থাপন প্রস্তুতি

কখন কোথায় কিভাবে কত সময় উপকরণ ব্যবহার হবে তার জন্যে শিক্ষককে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে। তাছাড়া উপকরণ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পারে। এ অবস্থার ফলে উপকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে সংরক্ষণ

একবারের জন্য উপকরণ ব্যবহার হয় না। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরায় যাতে ব্যবহার উপযোগী থাকে সেজন্য শিক্ষা উপকরণ যথাযথ সংরক্ষণের উপর উপকরণ ব্যবস্থাপনা অনেক নির্ভরশীল। আরসে কারণে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ কর্তার এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণ সংরক্ষণ

চার্ট বা তালিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা ও শিক্ষা উপকরণের চার্ট বা তালিকা তৈরি করে রাখতে হবে। পাঠ অনুযায়ী প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে চাহিদা অনুযায়ী যাতে সময়মতো ব্যবহার করতে পারেন তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, কার্যকর পাঠদান, শিখন-শিখানো কার্যক্রমকে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম এ কথার বলার অপেক্ষা রাখেনা।

দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

যেহেতু সহজে পাওয়া যায়না বা চাইলেই যখন তখন ক্রয় বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না সেহেতু এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। কেননা এগুলো একবার ব্যবহারের জন্য নয়। আর তাই এ জাতীয় শিক্ষা উপকরণ বেশ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হয়। নিম্নের উপস্থাপনায় দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হলো। যাতে করে এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

- উপকরণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্টক রেজিস্টার থাকবে;
- স্টক রেজিস্টারে সকল উপকরণের ক্রয় ও সংগ্রহের তারিখ লিপিবদ্ধ রাখতে হবে;
- সংরক্ষণ কক্ষটিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- প্রতিটি উপকরণে যাতে ধূলা-বালি না লাগে বাইরের থেকে তার জন্য কভার এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- উপকরণ ব্যবহার রেজিস্টার এর ব্যবস্থা করতে হবে। যিনি ব্যবহার করবেন তার স্বাক্ষর থাকবে। ব্যবহারের পর আবার তা নির্ধারিত স্থানে রেখে আসবেন। এতে করে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর দায়বদ্ধতা তৈরি হবে।

- উপকরণের নিয়মিত ব্যবহার যাতে হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে উপকরণের কার্যকারিতা বজায় থাকবে;
- উপকরণ বিন্যাস প্রত্যেক বিষয়অনুযায়ী হবে। লেবেলিং করা থাকবে, নাম থাকবে;
- প্রয়োজন মোতাবেক উপকরণের জন্য তালাযুক্ত আলমারির ব্যবস্থা করতে হবে;
- ভাঁজযুক্ত উপকরণ ঝুঁড়িতে থাকতে হবে;
- জীবজগতের স্পেসিমেন সংরক্ষণে ফরমালিন এর ব্যবস্থা করতে হবে;
- বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে উপকরণ সাজানো থাকবে;
- কেমিক্যাল জাতীয় উপকরণ নিরাপত্তাজনিত কারণে আলাদাভাবে সুবিন্যস্ত আকারে রাখতে হবে;
- ক্যাটালগ ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- পোকা মাকড়ের হাত হতে রক্ষার জন্য নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- কক্ষটির বাইরে শিক্ষা উপকরণ কক্ষ নামে সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে দিতে হবে। এতে করে সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত হবে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষা উপকরণগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে। পাশাপাশি প্রয়োজন মোতাবেক উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সর্বোপরি দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণ ক্রয় ও সংগ্রহ ব্যয় সংকোচন করাও সম্ভব হবে।

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিখন-শেখানো কাজকে সার্থক করে তুলতে শিক্ষক নানা প্রয়াস গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীর মনন-মেধা কাজে লাগিয়ে কল্পনা শক্তির বিকাশ, চিন্তা, দক্ষতার স্ফূরণ ঘটিয়ে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ প্রাণবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন। ফলে শিখন স্থায়ী হয়। শিখন-শেখানোর উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর তাই তো শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার অনস্বীকার্য। চীন দেশের সেই প্রবাদ আমরা সবাই জানি æOne picture is worth than 10,000 words” অর্থাৎ দশ হাজার শব্দের ব্যবহারের চেয়ে একটি ছবি অনায়াসে কোনো বিষয় সবার কাছে তুলে ধরা যায়। আর তাই তো শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় পাঠদানের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করেন।

ব্যবসায় উদ্যোগের শিক্ষা উপকরণ

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিখনকে শিক্ষার্থীর কাছে স্থায়ী ও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে যে সকল শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে তাকে বলা হয় শিক্ষা উপকরণ। ব্যবসায় উদ্যোগ এর শিক্ষা উপকরণগুলো নিম্নরূপ :

- চেক;
- ব্যাংক ড্রাফট;
- ব্যাংক;
- ক্যালেন্ডার;
- মানচিত্র;
- মাল্টিমিডিয়া;
- ক্যামেরা;
- ব্যবসায়িক মানচিত্র;
- ব্যবসায় উদ্যোক্তার ছবি;
- ব্যবসায় উদ্যোক্তার চাট;
- কুটির শিল্পজাত পণ্য, নকশীকাঁথা, বাশ-বেত সামগ্রী;
- পাঠ্য পুস্তক;
- ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য;

- ব্যাংক একাউন্ট খোলার ফরম পোস্টার পেপার তৈরি চার্ট;
- নকসা, চার্ট;
- বাজার গবেষণা চার্ট;
- স্ক্যানার;
- VIP কার্ড;
- গ্লোব;
- ইন্টারনেট, ই-মেইল;
- চক; হোয়াইট বোর্ড,
- পেনড্রাইভ;
- সিডি;
- মাল্টিমিডিয়া;
- ক্যালকুলেটর;
- ফ্যাক্স মেশিন।

উপরোক্ত তালিকাসমূহ হতে শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে ক্লাসকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব

আমরা ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষা উপকরণের ধারণায় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছি। শিক্ষারগুণগত মান উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা অর্জনে শিক্ষা উপকরণ শিক্ষককে সহায়তা করে থাকে। According to Saunders. æ No wise man refuses help and no wise teacher ignores aid.”

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্বপূর্ণ দিক

- শিখন স্থায়ী হয়;
- বিমূর্ত জিনিসকে মূর্ত করে;
- শিক্ষার্থীর চিন্তা দক্ষতা বাড়ে;
- সৃজনশীল দক্ষতা বাড়ায়;
- হাতে কলমে কাজ করায় ফলে দায়িত্ব বোধ তৈরি হয়;
- কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে সচেতন হয়;
- শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়;
- আত্মকর্মসংস্থান ক্ষেত্র সম্পর্কে অবগত হয়;
- শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে;
- পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে;
- পাঠকে সহজবোধ্য করে তোলে;
- আনন্দদায়ক পাঠদান সহায়তা করে;
- শিখন বাস্তব পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক;
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হয়;
- শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়;
- শিক্ষায় ICT-এর ব্যবহার নিশ্চিত হয়;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সবশেষে বলব একটি পাঠকে আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপনে শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব অতীব জরুরি।

সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সনাক্তকরণ ও উন্নয়ন

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার বিষয়কে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে শিক্ষককে শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার, সনাক্তকরণ উন্নয়নের দিকটি বিবেচনা করতে হয়। সাধারণ শিক্ষা উপকরণগুলো বলতে বোঝায় ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, কলম, পাঠ্যপুস্তক। এছাড়াও যে সকল উপাদানশিক্ষার্থীর কাছে পাঠদানকে সহজ, কার্যকর ও আনন্দদায়ক করে তাকে সহায়ক সামগ্রী বলা হয়ে থাকে। শিক্ষা উপকরণ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে।

- শ্রবণমূলক উপকরণ;
- দর্শনমূলক উপকরণ;
- শ্রবণ দর্শনমূলক উপকরণ;
- বিশেষ কার্যসম্পাদনমূলক উপকরণ;
- আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ;

উপরোক্ত উপকরণগুলো শিক্ষক প্রয়োজন মোতাবেক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সবার পক্ষে এই উপকরণ সব সময় ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কেননা কোনো কোনোটি অনেক ব্যয়বহুল। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষের একজন শিক্ষক একাধিক বিষয়ে প্রতিদিন পাঠদান করেন। সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায় অনুযায়ী উপকরণ ক্রয় ব্যয়সাধ্য। স্কুল শিক্ষকের পক্ষে তা ক্রয় ও সংগ্রহ কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। গ্রাম ও শহরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সমস্যা আছে। আর সে কারণে সহজলভ্য স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় এমনসব উপকরণের ছবি দিতে হবে। আর তাই তো শিক্ষা উপকরণ সনাক্তকরণের জন্য কাজ হাতে নিতে হবে ও এর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিতে হবে। সহায়ক সামগ্রী সনাক্তকরণ ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনা মাসিক বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে, দুষ্প্রাপ্য, স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণ সনাক্ত করে তার তালিকা তৈরি করতে হবে, লেবেলিং করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর পক্ষে তৈরিরযোগ্য উপকরণ তাদের দিয়ে করাতে হবে। এক্ষেত্রে পুরাতন ক্যালেন্ডার, পোস্টার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিবেন। উপকরণের ধরন অনুযায়ী সেগুলো দেয়ালে, ঝুড়িতে, আলমারির তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্যই বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের শেষে তা যথাস্থানে রাখতে হবে।

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. একক পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায় ?

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ বিষয়ের পরিকল্পনা বিষয়ের উপর একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ক) শিখন ফল এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

খ) শিখনফল লেখার জন্য উপযুক্ত ক্রিয়াপদগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

২. ক) পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কী বুঝায়?

খ) শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের নাম লিখুন।

৩. ক) পাঠ্যপুস্তক বলতে কী বুঝায় ?

খ) পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৪. ক) শিক্ষা উপকরণ কী ?

খ) শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করুন।

৫. ক) বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণের তালিকা তৈরি করুন।

খ) দুর্লভ ও স্বল্প সরবরাহকৃত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের উপায়সমূহ উপস্থাপন করুন।

ইউনিট ৫ : ব্যবসায় পরিচিতি

ব্যবসায়ের উৎপত্তি মানব সভ্যতার মতই প্রাচীন। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ে। যদিও শুরুতে প্রকৃত প্রদত্ত ফলমূল খেয়ে এবং পশু শিকার করে জীবন-যাপন শুরু করে কিন্তু দিনে দিনে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আওতাও বাড়তে থাকে। ফলে পশু শিকার, খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাথে সাথে শুরু হয় পণ্য বিনিময়ের মতো কর্মকাণ্ড। উৎপাদিত বা সংগ্রহিত পণ্য বা দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করার মাধ্যমে আদিম মানুষ নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর প্রচলন চালু করে। এই দ্রব্য বিনিময় প্রথা (Barter System) প্রচলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসায়ের শুরু হয়। কিন্তু পণ্য বা দ্রব্য বিনিময় করেও প্রয়োজন মেটানো যায় নি। ফলে দ্রব্য বিনিময়ের স্থলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা ও পরবর্তীকালে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়। মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনদেনকে ঘিরেই উদ্ভব হয়েছিল ব্যবসায়ের। তবে ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে ছিল মানুষের অভাববোধ। অভাব পূরণের লক্ষ্যেই মানুষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপার্জন প্রচেষ্টায় জড়িত হয়। এ অধ্যায়ে ব্যবসায় পরিচিতিসংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত দিকগুলো বর্ণনা করা হয়েছে-

৫.১ ব্যবসায়ের ধারণা, ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

৫.২ ব্যবসায়ের আওতা ও প্রকারভেদ এবং ব্যবসায়ের গুরুত্ব

৫.৩ ব্যবসায় পরিবেশ এবং বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ

৫.১ ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যবসায়ের ধারণা

সাধারণভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলে। পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা, হাঁস-মুরগি পালন করা, সবজি চাষ করাকে ব্যবসায় বলা যায় না। কিন্তু যখন কোনো কৃষক মুনাফার আশায় ধান চাষ করে বা সবজি ফলায় তা ব্যবসায় বলে গণ্য হবে। তবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যবসা বলে গণ্য হবে যদি সেগুলো দেশের আইনে বৈধ ও সঠিক উপায়ে পরিচালিত হয়। ইংরেজি Business শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো ব্যবসায়। Business শব্দের অর্থ হচ্ছে to the state of being busy either as an individual or society as a whole, doing commercially viable and profitable work. অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা সামগ্রিকভাবে সামাজিক কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা যে কাজটি বাণিজ্যিকভাবে বৈধ এবং লাভজনক। মূলত মুনাফা অর্জনের আশাতেই ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই সেবার মনোভাব থাকতে হবে। ব্যবসায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এতে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের যে সকল কর্মকাণ্ড পণ্য-দ্রব্য, সেবা সামগ্রী ও চিন্তা-ভাবনা উৎপাদন ও বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত এবং দেশের আইনে বৈধ সেগুলোকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের এ ধারাকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

প্রাচীন যুগ (Ancient Period)

প্রকৃতি নির্ভরতাই প্রাচীন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ফলমূল খেয়ে এবং পশু শিকার করে মানুষ তখন জীবন যাপন করত। প্রথম দিকে মানুষ বিচ্ছিন্ন ও যাযাবর অবস্থায় থাকলেও ধীরে ধীরে তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা শুরু করে এবং কৃষিকাজ ও পশুপালনের কৌশল আয়ত্ত করে। এক সময় দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি বা পরিবার যা উৎপাদন বা সংগ্রহ করে তা সেই পরিবারের জন্য উদ্ভূত কিন্তু তার প্রয়োজন এমন একটি দ্রব্যের যা তার পরিবারে নেই। অন্য পরিবারের ক্ষেত্রেও একই

সমস্যা দেখা দেয়। এভাবে উদ্ভূত সামগ্রী বিনিময়ের চিন্তা তাদের মাথায় আসে। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের অভাব মেটানোর মত কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচলন থেকে ব্যবসায়ের সূচনা হয়।



পশু শিকার



মৎস শিকার

মধ্যযুগ (Middle Age)

প্রাথমিকভাবে সামান্য উপকারে আসলেও চাহিদার ভিন্নতা, দ্রব্যের বিভাজনগত অসুবিধা, সময়মতো প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থা অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়তে থাকে। মানুষ বিকল্প উপায় খুঁজতে থাকে। এ সমস্যার সমাধানে দ্রব্যবিনিময়ের বিকল্প হিসেবে মূল্যবান ও দুস্পাপ্য শামুক, বিনুক, কড়ি ও পাথর বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এতে ব্যবসায়িক আওতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে লেনদেন প্রক্রিয়াও অনেকটা সহজতর হয়। পরবর্তী সময়ে তামা, রূপা ও সোনা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হওয়া শুরু হয়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধাতব মুদ্রা প্রচলনের ফলে ব্যবসায়ের পরিধি আরো বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়িক পণ্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট স্থানের। এভাবে বাজারের উদ্ভব হয়। বাজার সম্প্রসারণের সাথে সাথে সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নগর বা শহর, ব্যবসায় কেন্দ্র ও সৃষ্টি হয় বড় বড় ব্যবসায় গোষ্ঠী বা সংঘের। বড় বড় ব্যবসায় গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত উপমহাদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন মধ্যযুগের একটি উদাহরণ। মধ্য যুগের শেষ পর্যায়ে এসে ব্যবসায় আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে।



বাটখারা, উয়ারী-বটেশ্বর

বাটখারা, হরপ্পা



মধ্যযুগে ব্যবহৃত মুদ্রা

আধুনিক যুগ (Modern Period)

মধ্য যুগে ব্যবসায় বেশ সম্প্রসারিত রূপ লাভ করলেও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের ব্যাপক চাহিদা মেটানো ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় বের করার প্রচেষ্টায় বিশ্বের অগ্রসর জাতিগুলো নিয়োজিত ছিল। এ সময়ে বেশ কিছু আবিষ্কার উৎপাদন, বন্টন ও বাণিজ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও অবদান রাখে। জেমস ওয়াট (James Watt) এর বাষ্পীয় ইঞ্জিন, জেমস হার্গ্রেভিস (James Hargreaves) এর স্পিনিং জেনি, এবং এডমাউন্ড কার্থরাইট (Edmund Cartwright)-এর পাওয়ার লুম আবিষ্কার ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখে। ১৭৫০ সাল থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত

সময়কালে ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে একে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) বলে অভিহিত করা হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তি নির্ভরতায় ব্যাপক বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটে ব্যাংকিং, বিমা, বিজ্ঞাপন জাতীয় ব্যবসায় কর্মকাণ্ডের। বর্তমানে আইসিটি নির্ভর ব্যবসায় উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে।



জেমস ওয়াট এর বাষ্পীয় ইঞ্জিন (১৭৭৫)

ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ধারা

যুগের ক্রমধারা	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড
	• মোবাইল ব্যাংকিং প্রচলন • এটিএম কার্ড প্রচলন • ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ • বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রচলন • বিভিন্ন শিল্প কারখানার বিকাশ • প্রযুক্তির উন্নয়ন • শিল্প বিপ্লব
	• কাগজি মুদ্রার প্রচলন • বাজার ও শহর সৃষ্টি • ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব • বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রার ব্যবহার • বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দুস্ত্রাপ্য শামুক, ঝাঁনুক, কড়ি ও পাথর ব্যবহার
	• দ্রব্য বিনিময় • মৎস্য শিকার • ফলমূল আহরণ • কৃষিকার্য • পশু শিকার

৫.২ ব্যবসায়ের আওতা ও প্রকারভেদ এবং ব্যবসায়ের গুরুত্ব

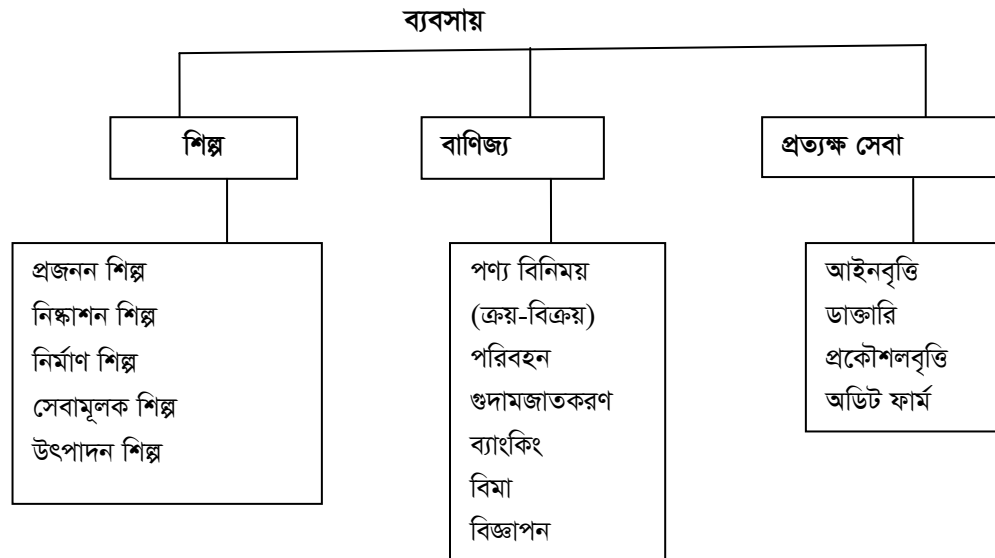
বর্তমানে ব্যবসায় শুধু পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পণ্য-দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, পণ্য-দ্রব্য বিনিময় ও এর সহায়ক কাজের সমষ্টিকে ব্যবসায় বলে। পণ্য-দ্রব্য বিনিময় সংক্রান্ত সহায়ক কাজে পরিবহন, বিমা, ব্যাংকিং, গুদামজাতকরণ ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দিন দিন ব্যবসায়ের আওতা ও ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। তবে আধুনিক ব্যবসায়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. শিল্প (Industry)

খ. বাণিজ্য (Commerce)

গ. প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Services)

নিম্নে ব্যবসায়ের আওতা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :



শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

শিল্পকে উৎপাদনের বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামালে রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলা হয়। বৃহদায়তন শিল্প প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। শিল্পের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়—

- শিল্পকে উৎপাদনের বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়;
- শিল্প প্রক্রিয়াজাতও পণ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত;
- শিল্প কাঁচামাল প্রস্তুত করে;
- শিল্প কাঁচামালকে সম্পূর্ণ পণ্যে রূপান্তর করে;
- শিল্প উপযোগ সৃষ্টি করে।

বর্তমানে শিল্পকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়।

শিল্পের প্রকারভেদ	ধারণা
কৃষিজাত শিল্প (Agriculture Industry)	এ জাতীয় শিল্প কৃষি পণ্য উৎপাদনে জড়িত। যেমন- ধান, গম, পাট উৎপাদন
প্রজনন শিল্প (Genetic Industry)	এ শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- নার্সারি, হ্যাচারি, পশু খামার, ইত্যাদি।
নিষ্কাশনশিল্প (Extractive Industry)	এ জাতীয় শিল্পের মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয়। যেমন- খনিজ শিল্প, মাটির নিচ থেকে পানি, গ্যাস বা তৈল উত্তোলন।
নির্মাণশিল্প (Construction Industry)	এ শিল্পের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, সেতু, দালান-কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।
উৎপাদন শিল্প (Manufacturing Industry)	এ শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয়। যেমন- বস্ত্র, চিনি শিল্প। এ শিল্পকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন; ● প্রক্রিয়াজাত শিল্প : যে শিল্প কাঁচামালকে বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত দ্রব্যে পরিণত করে। (পাট গাছ থেকে পাট, আখ থেকে চিনি, তুলা থেকে বস্ত্র), ● বিশ্লেষণমূলক শিল্প : একই বস্তু থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কয়েক প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। (যেমন- খনিজ তেলকে পরিশোধন করে পেট্রোল, কেরোসিন, মবিল পাওয়া যায়)। ● যৌগিক শিল্প : বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল মিশ্রণ করে একটি শিল্প পণ্য উৎপাদিত হয় (যেমন- সিমেন্ট, সাবান ও সার শিল্প) ● সংযোজন শিল্প : এ শিল্পে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ একত্রিত করে একটি পণ্য তৈরি করা হয় যেমন; টেলিভিশন, ঘড়ি ও সাইকেল শিল্প), ● সমন্বিত শিল্প : এ শিল্পে বিশ্লেষণ, যৌগিক ও সংযোজন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে দ্রব্য তৈরি করা হয়। (যেমন- লৌহ ও ইস্পাত শিল্প)
সেবা শিল্প (Service Industry)	এ শিল্পে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক করে। যেমন বিদ্যুৎ ও গ্যাস, উৎপাদন ও বিতরণ, পানি সরবরাহ, ব্যাংকিং ও স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি।

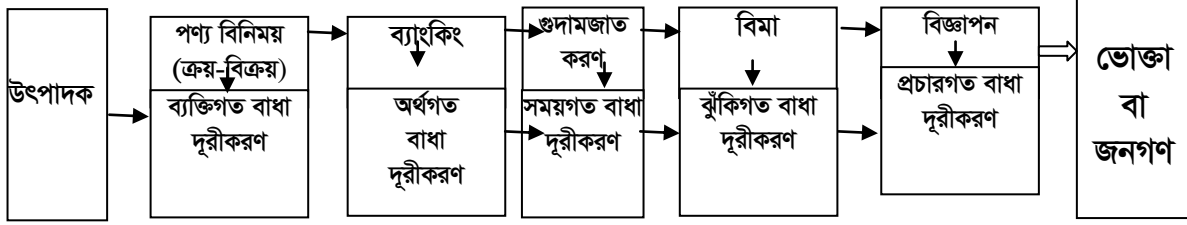
বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা সামগ্রী বণ্টনকারি শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। যে প্রক্রিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় এবং যে কার্যাবলি পণ্য বিনিময়, গুদামজাতকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, মোড়কিকরণ, অর্থায়ন, বিমাকরণ, পরিবহন ইত্যাদি কার্যকে সাহায্য করে তাকে বাণিজ্য বলে। এ সকল বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আধুনিককালে বাণিজ্যকে ব্যবসায় টু ব্যবসায় (Business to Business) বলেও অভিহিত করা হয়। বাণিজ্যের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়-

- বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা সামগ্রী বণ্টনকারি শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়;
- বাণিজ্যকে জনসাধারণ বা ভোক্তাদের নিকট পণ্য-সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কার্যসমষ্টি বলা হয়;
- বাণিজ্য পণ্যের ব্যক্তিগত বাধা অপসারণ করে;
- বাণিজ্য পণ্যের অর্থগত বাধা অপসারণ করে;
- বাণিজ্য পণ্যের সময়গত বাধা অপসারণ করে;

- বাণিজ্য পণ্যের ঝুঁকিগত বাধা অপসারণ করে;
- বাণিজ্য পণ্যের প্রচারসংক্রান্ত বাধা দূর করে।
- আধুনিককালে বাণিজ্যকে ব্যবসায় টু ব্যবসায় (Business to Business) বলেও অভিহিত করা হয়।

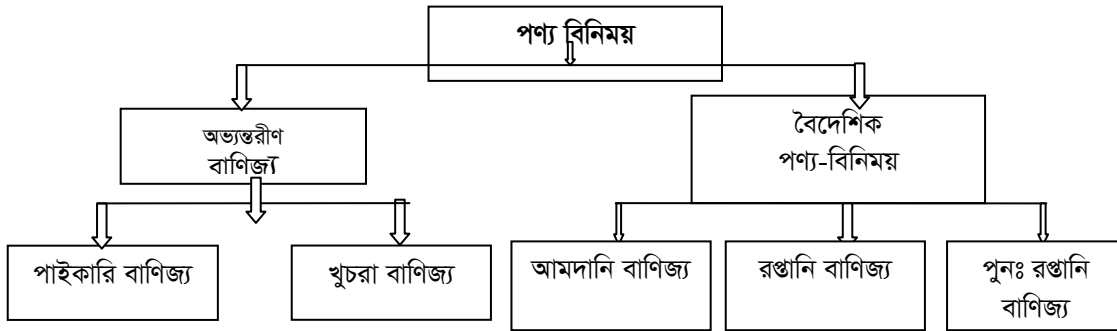
বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানের কাজ



বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখা/প্রকারভেদ

১. পণ্য বিনিময় (Trade)

বাণিজ্যের প্রধান শাখা হচ্ছে পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিনিময়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করার কাজই হচ্ছে পণ্য বিনিময়। পণ্য বিনিময়ের উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। পণ্য বিনিময় হলো ব্যবসায় কার্যাবলির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় যা ক্রয়বিক্রয়ের সাথে জড়িত। পণ্য বিনিময়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- নিম্নে পণ্য বিনিময়ের বিভাজন ছক আকারে দেখানো হলো-



১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Home Trade)

কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কার্যাবলি সংগঠিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- পাইকারি ব্যবসায় (Wholesale Trade) :** উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে তখন তাকে পাইকারি ব্যবসায় বলে।
- খুচরা ব্যবসায় (Retail Trade) :** যখন পণ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী ও পাইকারি ব্যবসায়ী অল্প পরিমাণ করে সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে তখন তাকে খুচরা ব্যবসায় বলে।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)

যখন এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয়, তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। এ ধরনের বাণিজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

- আমদানি বাণিজ্য (Import trade) :** দেশের চাহিদা পূরণের জন্য যখন কোন দেশ বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে।
- রপ্তানি বাণিজ্য (Export trade) :** যখন কোনো দেশ অন্য দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে।
- পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য (Re-export trade) :** অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হয় যাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে।

প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

প্রত্যক্ষ সেবা আধুনিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রত্যক্ষ সেবা বলতে সেসব সেবাকর্মকে বুঝায় যা ভোক্তা বা ক্রেতাকে অর্থের বিনিময়ে সরাসরি প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, সংগীত শিল্পী, বিউটিশিয়ান, হেয়ার ড্রেসার, প্রভৃতি পেশাজীবীরা বিভিন্ন রকম সেবাকর্ম অর্থের বিনিময়ে সরাসরি প্রদান করে থাকেন। এ জাতীয় সকল সেবাকর্ম বা বৃত্তি প্রত্যক্ষ সেবা হিসেবে পরিচিত।

প্রত্যক্ষ সেবার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়-

- অর্থের বিনিময়ে সেবা বিক্রি করা হয়;
- স্বাধীন পেশা অনেকের পছন্দ;
- অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো পুঁজিনির্ভর নয়;
- পুঁজির চেয়ে নৈপুণ্য ও সুনাম বেশি মূল্যায়িত হয়।

শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার মধ্যে পার্থক্য

ব্যবসায়ের শাখা হিসেবে সাধারণভাবে শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবাকে একই ধরনের অর্থনৈতিক কর্ম বলে বিবেচিত হয়। তবে এদের মধ্যে হচ্ছে বেশ কিছু পাথক্য রয়েছে।

পার্থক্যের বিষয়	শিল্প	বাণিজ্য	প্রত্যক্ষ সেবা
ধারণা	যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামালে রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার-উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলা হয়।	ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।	প্রত্যক্ষ সেবা বলতে সেসব সেবাকর্মকে বুঝায় যা ভোক্তা বা ক্রেতাকে অর্থের বিনিময়ে সরাসরি প্রদান করা হয়ে থাকে।
আওতা	শিল্পের আওতা বেশ ব্যাপক। প্রজনন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিষ্কাশন, উৎপাদন ও নির্মাণ শিল্পের আওতাভুক্ত।	বাণিজ্যের আওতাও বেশ ব্যাপক। পণ্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, ব্যাংকিং, গুদামজাতকরণ, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন সব কিছুই এর আওতাভুক্ত।	আওতা তুলনামূলকভাবে ছোট। চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল, সাংবাদিকতা, সংগীত, বিউটি পাওয়ার, সেলুন, লাইব্রেরি ইত্যাদি এর আওতাভুক্ত।
পুঁজির পরিমাণ	এ ক্ষেত্রে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে স্থায়ী সম্পত্তি ও খরচ খাতে।	এক্ষেত্রেও অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে চলতি খরচ খাতে। তবে শিল্পের থেকে কম পুঁজির প্রয়োজন হয়।	এক্ষেত্রে মূলধন শিল্প ও বাণিজ্যের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম লাগে। এখানে বেশি প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতা।
উপযোগ সৃষ্টি	মূলত রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে	ব্যক্তিগত, স্থানগত, সময়গত, বুদ্ধিগত ও প্রচার সংক্রান্ত উপযোগ সৃষ্টি করে।	সেবাসংক্রান্ত উপযোগ সৃষ্টি করে
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান। দক্ষ ও অদক্ষদের সমান সুযোগ।	এখানেও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে।	শিল্প ও বাণিজ্যের মতো ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকলেও সৃজনশীল ও স্বাধীনচেতা লোকদের কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র।
উপযুক্ত ক্ষেত্র	যৌথ মূলধনী ব্যবসায়	যৌথ মূলধনী ও অংশীদারি ব্যবসায়	এক মালিকানা ও আত্মকর্মসংস্থান

ব্যবসায়ের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য হলেও ব্যবসায় যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই গড়ে উঠেছে ছোট-বড় দোকান থেকে শুরু করে বিশাল শিল্প কারখানা। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের পৃথিবীতে সে সকল দেশ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে যে দেশগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত। ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ব্যবসায়ের ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, মূলধন গঠিত হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমে বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ব্যবসায় গবেষণা ও সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ঘটায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে দেশে দেশে পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদানের সাথে সাথে সংস্কৃতির বিনিময়ও ঘটে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। ব্যবসায় একটি স্বাধীন পেশা বিধায় দেশের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ বিত্তের সকলে জীবিকা অর্জনের সহজ ও আকর্ষণীয় উপায় হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা হয়। ফলে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি হয়। এ সম্মিলিত সঞ্চয়কে একত্রিত করে দেশের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের ফলে ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় যে, অল্প সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তি বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। এভাবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় না দেশের জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। ব্যবসায় উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ঘিরে নতুন নতুন শহর, বন্দর গড়ে ওঠে। যে দেশ ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের সম্পদের যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে সে দেশ তত বেশি উন্নত। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোনো দেশের সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা ক্রমবর্ধমান হারে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে এবং জনগণের জীবনযাপনের মান উন্নয়নে অবদান রাখে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র বিমোচন স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশের ৯৬ ভাগ শিল্পই কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত। কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এ সকল শিল্প। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এ শিল্পের সাথে জড়িত। স্বল্প মূলধন, স্থানীয় কাঁচামাল, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, সৃজনশীলতা, পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে মহিলাদের কর্মশক্তি ব্যবহার করে এ জাতীয় ব্যবসায় গড়ে ওঠে। ফলে লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দেশের গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য লালন ও বিকাশ এবং সারাবিশ্বে তা ছড়িয়ে দিতেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়

জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজে নিয়োজিত হয় তখন তাকে বৃত্তি (Occupation) বলে। অন্যদিকে যখন বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কোন জ্ঞান বা দক্ষতাকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে তাকে পেশা (Profession) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায় জীবিকা অর্জনের প্রভাবশালী উপায় হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। বর্তমানকালেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বৃত্তি বা পেশা হিসেবে ব্যবসায় জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কারণ জীবিকা অর্জনের অন্যান্য উপায় যেমন- চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। নিম্নের যৌক্তিকতা থেকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়-

- সাধারণ মানুষ স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।
- ছোট বড় নানা ধরনের ব্যবসায়কে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে।
- চাকরিতে উন্নতি লাভের সুযোগ সীমিত কিন্তু ব্যবসায়ে তা ব্যাপক। ফলে শ্রম, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
- একটি ব্যবসায়ের মাধ্যমে শুধু একজন ব্যক্তিরই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না, বরং আরো অনেকের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে ব্যবসায়ের প্রসারের ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য ব্যবসায় একটি পছন্দনীয় জীবিকা অর্জনের উপায় বা পেশা।
- অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের মধ্যে অনেক সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।
- ব্যবসায় থেকে একজন যোগ্য ও সৎ ব্যবসায়ী শুধু নিজের কল্যাণই সাধন করেন না, তার দ্বারা ক্রেতা, ভোক্তা, সরকার, সমাজ, কর্মচারী সবাই উপকৃত হয়।

৫.৩ ব্যবসায় পরিবেশ, বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ

ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা

পরিবেশ হলো কোনো অঞ্চলের জনগণের জীবনধারা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের সমষ্টি। পারিপার্শ্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়, বনভূমি, জাতি, ধর্ম, মনোভাব ও মূল্যবোধ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি। পরিবেশ দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনধারা, আচার-আচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে সামষ্টিক অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রভাবিত হয়। যেসব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, উন্নতি ও অবনতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক পরিবেশ হলো ব্যবসায় সংগঠনকে পরিবেষ্টিত সকল অবস্থা, উপাদান ও শক্তির সমষ্টি যা উক্ত ব্যবসায় বা তার ব্যবস্থাপকের কার্যকারিতা বা সফলতাকে প্রভাবিত করে। ব্যবসায়িক পরিবেশ অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। কোনো স্থানের ব্যবসায়-ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর। পরিবেশ ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

ব্যবসায় পরিবেশের উপাদান

যেসব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, উন্নতি ও অবনতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে। ব্যবসায়ের এ সকল উপাদান ব্যবসায় সংগঠনের গঠন, পরিচালনা, প্রসার, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সকল কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত করে থাকে। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধানত সাত ভাগে ভাগ করা যায়।

ব্যবসায় পরিবেশ	উপাদান
১. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural environment)	• ভূপ্রকৃতি • জলবায়ু • ভূমি • ভৌগোলিক অবস্থান • প্রাকৃতিক সম্পদ • সাগর ও নদনদী • দেশের আয়তন
২. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic environment)	• সঞ্চয় ও বিনিয়োগ • মূলধন • অর্থ ও ব্যাংকিং • বাজার • আর্থিক প্রতিষ্ঠান • যোগাযোগ ব্যবস্থা • মাথাপিছু আয়
৩. রাজনৈতিক পরিবেশ (Political environment)	• সরকার • সার্বভৌমত্ব • আইন শৃঙ্খলা • রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা • সরকারি নীতিমালা • আন্তর্জাতিক সম্পর্ক • প্রতিবেশি দেশের সাথে সম্পর্ক

ব্যবসায় পরিবেশ	উপাদান
৪. সামাজিক পরিবেশ (Social environment)	• জাতীয়তা • জনসংখ্যা • ধর্মীয় বিশ্বাস • ভোক্তাদের মনোভাব • মানব সম্পদ • শিক্ষা ও সংস্কৃতি • ঐতিহ্য • মূল্যবোধ ও রুচি
৫. আইনগত পরিবেশ (Legal environment)	• বাণিজ্যিক আইন • শিল্প আইন • পরিবেশ সংরক্ষণ আইন • ভোক্তা আইন • প্যাটেন্ট আইন, • কপিরাইট আইন • সমবায় আইন • বিমা আইন
৬. প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technical environment)	• প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ • কারিগরি দক্ষতা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠান • উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান • প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ-সুবিধা • প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসায়ের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি
৭. আন্তর্জাতিক পরিবেশ (International environment)	• বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক • দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি • অর্থনৈতিক জোট

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment)

আমাদের চারপাশে যে সকল প্রকৃতি প্রদত্ত বা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উপাদান রয়েছে যেমন- ভূমি, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, পাহাড়-পর্বত, সাগর ও নদ-নদী, ভৌগোলিক অবস্থান, জনগোষ্ঠী ইত্যাদির সম্মিলনে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। পৃথিবীতে যে রাষ্ট্র যত বেশি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ সে সকল দেশ বা অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশে তত বেশি উন্নতি লাভ করেছে। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল উপাদান সকল দেশে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ফলে দেখা যায় কোন অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ আবার কোনো অঞ্চল কৃষিনির্ভর ব্যবসায়-বাণিজ্যে এগিয়ে আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে।

২. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশের ন্যায় অর্থনৈতিক পরিবেশও ব্যবসায়-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় কোনো দেশের জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক কাঠামো, মূলধনের পরিমাণ, সম্ভব মানসিকতা, মোট জাতীয়

উৎপাদন, মাথাপিছু জাতীয় আয়, ভোক্তা প্রবণতা, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা, মূল্যস্তর, ব্যাংক ও মুদানীতি, পুঁজি বাজার, মুদ্রাস্ফীতি, কর ও শুল্ক কাঠামো, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানি নীতি ইত্যাদির একক ও সার্বিক অবস্থা এবং প্রভাব। ব্যবসায় যেহেতু একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাই অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো যে কোনো দেশের ব্যবসায় উন্নয়নে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রভাব রাখে। কোনো দেশের গতিশীল বিনিয়োগ নীতি, ঋণদান নীতিতে উদারতা বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, কর অবকাশ যেমন শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে অবদান রাখে তেমনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নেতিবাচক অবস্থার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ ব্যাহত হয়।

৩. রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের কাঠামো ও স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অনুকূল শিল্প ও বাণিজ্যনীতি, প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মঘট, ব্যবসায়-বান্ধব শিল্প ও বাণিজ্য নীতির অভাব ইত্যাদি প্রতিকূল রাজনৈতিক উপাদান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থাপনে যেমন সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয় না তেমনি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারিগণও বিনিয়োগে এগিয়ে আসে না।

৪. সামাজিক পরিবেশ (Social Environment)

কোনো দেশের সামাজিক পরিবেশ সে দেশের মানুষের আচার-আচরণ, অভ্যাস, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, ঐতিহ্য ইত্যাদি উপাদানে গঠিত হয়। জনগণের উদার ও নৈতিক মনোভাব যেমন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে তেমনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও চরম জাতীয়তাবাদী আদর্শের কারণে অনেক সময় বিদেশি বিনিয়োগ আসে না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যতবেশি অনুকূল ও উদার হবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারও তত দ্রুত হবে।

৫. আইনগত পরিবেশ (Legal Environment)

আইনগত পরিবেশের উপাদানগুলো হলো কোনো দেশে বিদ্যমান সকল ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন যেমন— অংশীদারি আইন, কোম্পানি আইন, শিল্প আইন, বাণিজ্যিক আইন, কর আইন, শ্রম আইন, আয়কর আইন, বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন, আমদানি-রপ্তানি আইন, কপিরাইট আইন, প্যাটেন্ট আইন ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক আইন ইত্যাদি। যে দেশের আইনগত পরিবেশের উপাদানগুলো যত উদার ও ব্যবসায়-বান্ধব সে দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ততবেশি অগ্রসরমান।

৬. প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technical Environment)

প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে বোঝায় এমন সকল উপাদান ও শক্তির সমাবেশকে যেগুলো নতুন নতুন পণ্য ও সেবা সামগ্রী এবং এগুলোর বাজার ও ভোক্তা চাহিদা সৃষ্টির পথকে প্রসারিত করে। বর্তমান বিশ্বে দেখা যাচ্ছে যে সকল দেশ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যত বেশি করতে পেরেছে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তারা তত বেশি সুনাম ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বিগত কয়েক দশক যাবত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে। সাম্প্রতিককালে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সারাবিশ্বে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল তার কারণে আজও তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং শিল্পে অগ্রসর।

৭. আন্তর্জাতিক পরিবেশ (International Environment)

ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলতে এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বক্রিয় উপাদানসমূহের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে বোঝায়। এ সকল উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি,

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট, জাতিসংঘের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানগুলো যে দেশে বেশি অনুকূল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সে দেশ তত বেশি অগ্রসর।

কর্মপত্র-১

ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ

পরিবেশের উপাদান	ব্যবসায়ের উপর প্রভাব
১. প্রাকৃতিক পরিবেশ	
২. অর্থনৈতিক পরিবেশ	
৩. রাজনৈতিক পরিবেশ	
৪. সামাজিক পরিবেশ	
৫. আইনগত পরিবেশ	
৬. প্রযুক্তিগত পরিবেশ	
৭. আন্তর্জাতিক পরিবেশ	

বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ

এককালে এ অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সারাবিশ্বে বিখ্যাত ছিল। বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও এক মালিকানা ব্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এ জাতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে জড়িত। ফলে দেশের অর্থনীতিতে ব্যবসায় তথা শিল্প ও বাণিজ্যের অবদান প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। তবে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ব্যবসায়িক পরিবেশের সকল উপাদানগুলো অনুকূল না হলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করে টিকে থাকা কঠিন। নিম্নে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হলো।

প্রাকৃতিক উপাদান : প্রাকৃতিক পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই বাংলাদেশে ব্যবসায় স্থাপনের জন্য অনুকূল। দেশের প্রায় সকল অংশই নদী বিধৌত। ছোট-বড় মিলিয়ে এ দেশে মোট ২৩০টি নদী রয়েছে। ফলে সহজেই এখানে কৃষিজাত বিভিন্ন শিল্প ও ভোগ্য পণ্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে নদী পথে ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহন সহজ ও খরচ কম। তবে অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনেক নদীতে চর পড়ে নদী পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাস এদেশে বিদ্যমান। দেশে বিদ্যমান খনিজ কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা ও খনিজ তেল শিল্প বিকাশে সহায়ক। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। অন্যদিকে দিন দিন বনভূমির পরিমাণ কমে গেলেও আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ। অসংখ্য নদী বিধৌত ও সমুদ্র বেষ্টিত হওয়ায় মৎস্য শিল্প বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশও এখানে বিদ্যমান। তবে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও

অতিবৃষ্টি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা বলা যায় বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। এ উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের ব্যবসায়িক উন্নতি অনেক বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিক উপাদান : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর কয়েকটির ভিত্তি বেশ মজবুত হলেও অনেকগুলোর ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, গ্রামীণ জনগণের ব্যাংকিং সেবা ও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় কম সুবিধা, প্রশাসনিক জটিলতা, দালাল শ্রেণির লোকদের হয়রানি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা কাটাতে পারলে বাংলাদেশ ব্যবসায় বিকাশে আরও দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন গ্রামে-গঞ্জে ব্যাংকিং ও ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া এবং সহজতর করা।

সামাজিক উপাদান : এ দেশের মানুষ জাতিগত, ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদার, পরিশ্রমী, এবং সৃজনশীল। অতীতে জাহাজ নির্মাণ করে এবং মসলিন কাপড় উৎপাদন করে এ দেশের মানুষ তাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছে। সোনারগাঁও এক সময় ব্যবসায়, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, কারু শিল্পে ছিল বিশ্বসেরা। বর্তমানেও জামদানি শাড়ি তৈরি এবং জাহাজ নির্মাণ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখস্ত নির্ভরতা থেকে বের করে আরো দক্ষ ও সৃজনশীল করতে পারলে ভবিষ্যত প্রজন্ম শিল্প, বাণিজ্য, গবেষণা আরও বেশি সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারবে। সাথে সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

রাজনৈতিক উপাদান : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মঘট, ব্যবসায়-বান্ধব শিল্প ও বাণিজ্য নীতির অভাব ইত্যাদি প্রতিকূল রাজনৈতিক উপাদান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারিগণও বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় না। বাংলাদেশে ব্যবসায়ের উক্ত রাজনৈতিক উপাদানের সবগুলো কাজক্ষত পর্যায়ে বিদ্যমান নেই। শ্রমিক অসন্তোষ, টেন্ডারের ক্ষেত্রে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, রাজনৈতিক হানাহানি, জনসম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনসহ বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসায়ের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত করা যায়।

আইনগত উপাদান : আইনগত পরিবেশের বেশ কিছু উপাদান বাংলাদেশে আধুনিক ও যুগোপযোগি হলেও অনেকগুলো বেশ পুরাতন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব আইন তৈরি এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ : সাধারণত দেখা যায় যে, যে সকল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদানগুলো উন্নত তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও উন্নত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানগুলো অনেকক্ষেত্রেই অনুকূল। এদেশে ব্যবসায়ের সকল শাখায় প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির অনেক ইলেকট্রনিকেল ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে এবং তা বিদেশে ও রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়া বিদেশে থেকে কোনো কোনো জিনিসের প্রধান প্রধান অংশ আমদানি করে দেশে তৈরি বাকি অংশের সাথে এসেমবলিং বা সংযোজন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে তৈরি জাহাজও আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে।

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ক. ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়?
- খ. প্রাচীন যুগে ব্যবসায় কিরূপ ছিল?
- গ. মধ্য যুগের ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কীকী?
- ঘ. আধুনিক যুগের ব্যবসায়ের উদাহরণ দিন।
- ঙ. ব্যবসায় কত প্রকার ও কী কী?
- চ. ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ক. ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করুন।
খ. প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুন।
২. ক. ব্যবসায়ের আওতা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
খ. ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. ক. জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায় ব্যাখ্যা করুন।
খ. শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুন।
৪. ক. ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
খ. বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ কতটা অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোর আলোকে মূল্যায়ন করুন।

ইউনিট : ৬ ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকা। দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদ ও মানবসম্পদকে ব্যবহার করে এবং নিজেদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা অবদান রেখে চলেছে। আমাদের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অবদান অনস্বীকার্য। এ অধ্যায়ে ব্যবসায় উদ্যোগের বিভিন্ন দিকসহ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে-

৬.১ উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য

৬.২ ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি

৬.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব

৬.৪ ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক

৬.৫ বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা ও বাধা দূরীকরণের উপায়

৬.৬ উদ্যোগ ও আত্মকর্মস্থান এবং আত্মকর্মস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

৬.১: উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য

উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে এগুলোর অর্থ, সংজ্ঞা, কার্য সম্পাদনের পরিবেশ, কার্যাবলির ধরন ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদ্যোগ বলতে বোঝায় কোনো কিছু উদ্ভাবনের ক্ষমতা; কোনো সুযোগ সৃষ্টি বা উদ্ভাবন এবং ঐ সব সুযোগের ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের, পরিবারের, সমাজের, জাতির, রাষ্ট্রের এমনকি বিশ্ববাসীর উপকার বা উন্নতি সাধন করা। উদ্যোগকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। যেমন- কোনো কিছু করার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছা ও কর্মশক্তিই হলো উদ্যোগ; কোনো সমস্যা সমাধানকল্পে প্রণীত কোনো পরিকল্পনা বা প্রোগ্রামকে উদ্যোগ বলা যায়; অন্যেরা শুরু করার আগে কোনো কিছু করার কর্মশক্তি বা সুযোগ এবং ইচ্ছাই হচ্ছে- উদ্যোগ; উদ্যোগকে ব্যক্তিগত গুণ হিসেবে দেখা হয়- যখন কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোনো কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব নেন; কোনো কাজ পূর্বে শুরু হলেও পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণকেও উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়া উদ্যোগ বলতে আরো বেশ কর্মকাণ্ডকে উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করা যায়। যেমন- নিজের কর্মসংস্থানের জন্য জ্ঞান, শিক্ষা, দক্ষতা ও বিদ্যমান পরিবেশের আলোকে কোনো কাজে হাত দেয়া; পারিবারিক কোনো সমস্যা যেমন ভুল বোঝাবুঝি, কলহ বা দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা গ্রহণ করা; সামাজিক অনগ্রসরতা যথা : শিক্ষা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি দূরীকরণে এগিয়ে আসা; রাষ্ট্রীয় পর্যায় আঞ্চলিক উন্নয়ন, পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান ভুল বুঝাবুঝি ইত্যাদি নিরসনের পদক্ষেপ নেয়া; বৈশ্বিক পর্যায় মানবাধিকার রক্ষা, ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা নেয়াকে উদ্যোগ বলা হয়।

অন্যদিকে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয় - তাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়। কোনো একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করতে হয় এবং সর্বোপরি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ও চিন্তা করতে হয়। ‘সুতরাং কোনো ব্যবসায় স্থাপন তথা ঝুঁকি গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায় উদ্যোগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ওয়েবস্টার (Webster) ডিকসনারিতে ,æঅর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিতকরণ এবং ঝুঁকিগ্রহণ করার ক্ষমতাকে উদ্যোগ বলা হয়েছে।”

ফিনারি (Finnery, 1977)-এর মতে,æপরিবেশের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া এবং অর্থনৈতিক সুযোগকে চিহ্নিত করা, উদ্যোগ নেয়া এবং কাজে লাগানোর ক্ষমতাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।”

রবার্ট ডি হিসরিক (Robert D. Hisrich) তাঁর Entrepreneurship গ্রন্থে উদ্যোগের সংজ্ঞায় বলেছেন, æব্যবসায় উদ্যোগ হলো সংশ্লিষ্ট আর্থিক, কায়িক ও সামাজিক ঝুঁকি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সময় ও প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে মূল্যবান ভিন্নধর্মী কোনো জিনিস তৈরি এবং ফলস্বরূপ আর্থিক পুরস্কার এবং ব্যক্তিক সন্তুষ্টি অর্জনের একটা প্রক্রিয়া।” উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, উদ্যোগ সার্বিক পরিবেশের একটা সার্বজনীন প্রক্রিয়া আর ব্যবসায় উদ্যোগ তারই এক অংশ বিশেষ। তাই উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

পার্থক্যের বিষয়	উদ্যোগ	ব্যবসায় উদ্যোগ
ধারণা	উদ্যোগ হচ্ছে কোনো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করা এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করা।	ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার সংকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের কাজ।
ক্ষেত্র	মানব সমাজের জীবন পরিক্রমায় পরিব্যাপ্ত সব ক্ষেত্র। ব্যবসায় উদ্যোগের তুলনায় এর ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক।	ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সব ক্ষেত্র। সাধারণ উদ্যোগের তুলনায় এর ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।
পরিবেশ	পারিবারিক, সামাজিক, আঞ্চলিক এবং জাতিগত আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত।	অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।
ধরন	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।	ব্যক্তিক, গ্রুপভিত্তিক, সরকারি, বেসরকারি, পিপিপি, কর্পোরেট ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ।
আইনগত বাধ্যবাধকতা	পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রভাবিত। পরোক্ষভাবে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।	বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।
সরকারি হস্তক্ষেপ	সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেয়া হয়।	প্রতিটি পদক্ষেপে সরকারি হস্তক্ষেপ বিদ্যমান।

ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য

ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোক্তা পরস্পর নির্ভরশীল এবং ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উদ্যোগ ছাড়া যেমন উদ্যোক্তার কাজ হয় না, তেমনি উদ্যোক্তা ব্যতীত কোনো উদ্যোগ সফল হয় না। জোসেফ এ. শুম্পিটার মতে (Joseph A. Schumpeter) “উদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন সৃজনশীল ধ্বংসকারী যিনি পূর্বে ছিল না এমন নতুন উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তর করে অর্থনীতিতে গতিশীল ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেন।” উদ্যোগ যে কোনো বিষয়ের ব্যাপারেই হতে পারে কিন্তু লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে কর তুমি বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পার। এখন নতুন এক ধরনের বেতের চেয়ার দেখে সেটা বানানোর চেষ্টা করলে। এটি তোমার উদ্যোগ। এখন তুমি যদি অর্থ সংগ্রহ করে বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরির দোকান স্থাপন করে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা কর, তখন এটি হবে ব্যবসায় উদ্যোগ। ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন কিন্তু অন্যান্য উদ্যোগের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। সবশেষে বলা যায়, তিনিই হচ্ছেন একজন উদ্যোক্তা যিনি পরিবেশে বিদ্যমান সুযোগসমূহ চিহ্নিত করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ও সম্পদ সংগ্রহ করেন এবং তা কাজে লাগিয়ে মুনাফা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করেন।

পার্থক্যের ক্ষেত্র	ব্যবসায় উদ্যোগ	ব্যবসায় উদ্যোক্তা
ধারণা	উদ্যোগ হচ্ছে কোনো কিছু করার ইচ্ছা এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করা।	যিনি নতুন কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন - তিনি হচ্ছেন -উদ্যোক্তা
প্রকৃতি	উদ্যোক্তার কার্য প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রূপ হচ্ছে-উদ্যোগ।	উদ্যোগ কার্যক্রম যার মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তিনি হচ্ছেন- উদ্যোক্তা।
সুযোগ	উদ্যোগ হচ্ছে এক প্রকার সুযোগ যেটি সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করা হয়।	উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।
সম্পদ সৃষ্টি	সম্পদ সৃষ্টির এক গতিশীল প্রক্রিয়া হচ্ছে -উদ্যোগ।	মেধা, দক্ষতা, শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তা এ সম্পদ সৃষ্টি করেন।
ঝুঁকি	উদ্যোগ প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে-ঝুঁকি।	সাফল্য নিশ্চিত নয় জেনেও ঝুঁকি নিয়ে উদ্যোক্তা কাজে অগ্রসর হন।

পার্থক্যের ক্ষেত্র	ব্যবসায় উদ্যোগ	ব্যবসায় উদ্যোক্তা
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ	চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজ হচ্ছে উদ্যোগ।	চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অসাধ্যকে সম্ভব করে সাফল্য অর্জনই উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য।
উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা	উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা প্রদর্শনের এক গতিময় প্রক্রিয়া।	সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূলক কাজে উদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন গতিশীল ব্যক্তিত্ব।
সংগঠন	উদ্যোক্তার কল্পিত, সৃষ্ট, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগটিই হচ্ছে সংগঠন যা উদ্যোক্তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিয়োজিত।	উদ্যোক্তা হলেন সংগঠক যিনি ভূমি, শ্রম, মেধা ও মূলধনকে একত্র করে এদের লক্ষ্যমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও সৃজনশীল ব্যবস্থাপকের মধ্যে সম্পর্ক

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে সাথে বর্তমানে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নতুন এক ধরনের উদ্যোক্তার আবির্ভাব ঘটেছে যাদের সৃজনশীল ব্যবস্থাপক বলা হয়। এরা পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিপণন ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণার প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে নিয়ে যান। তারা প্রতিষ্ঠানের মালিক অধীনে এবং সংগঠন কাঠামোর মধ্যেই এ কাজ সম্পাদন করেন। উদ্যোক্তা ও সৃজনশীল ব্যবস্থাপকের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

বিষয়	ব্যবসায় উদ্যোক্তা (Entrepreneur)	সৃজনশীল ব্যবস্থাপক (Intrapreneur)
উৎসাহ ও নির্ভরশীলতা	উদ্যোক্তা স্বাধীন এবং নিজের মতো করে কাজ করেন।	উদ্যোক্তার উৎসাহে এবং তার অধীনে কাজ করেন।
তহবিল সরবরাহ	উদ্যোক্তা নিজেই প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিয়ে থাকেন।	কোনো তহবিল বা মূলধন সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট নন।
পরিচালনা	উদ্যোক্তা বাইরে অবস্থান করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।	সংগঠনের ভিতর থেকে নতুন উদ্ভাবনের কাজ করেন।
ঝুঁকি বহন	উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি ও দায় দায়িত্ব বহন করেন।	ব্যবসায়ের কোনো ঝুঁকি বহন করেন না। তিনি কেবল তার কাজের জন্য দায়ী থাকেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃজনশীল ব্যবস্থাপকগণ ব্যবসায়ের মধ্যে থেকেই সৃজনশীল ধারণা প্রয়োগ করে এমন দক্ষ হয়ে ওঠেন যে তারা নিজেরাই নতুন উদ্যোক্তায় পরিণত হন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেন।

৬.২ : ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি বর্তমানে বহুল প্রচারিত একটা ধারণা। ব্যবসায় উদ্যোগ (Entrepreneurship) এবং ব্যবসায় উদ্যোক্তা (Entrepreneur) শব্দ দু'টি একটি অন্যটির পরিপূরক। যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল, সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন, নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলার মাধ্যমে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তিনি ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে বিশ্লেষণ করা হয়। নিম্নে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে ব্যবসায় উদ্যোগের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যাবে :

- **একটা প্রক্রিয়া (A Process) :** সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নিরবচ্ছিন্ন কিছু কাজের নিয়মানুগ সমষ্টিই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। গঠনমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন প্রস্তুত করা, উৎপাদনের মানবিক ও অ-মানবিক উপকরণ সংগ্রহ, প্রযুক্তিসহ উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ব্যবহারের সুযোগ অন্বেষণ, সমন্বয় সাধন এবং ধারাবাহিক নেতৃত্ব দান-প্রভৃতি হলো উদ্যোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়।

- **সৃজনশীলতা (Creativity):** উদ্যোগ সৃষ্টির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো সৃজনশীলতা। নতুন কোনো চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষমতাই হলো সৃজনশীলতা। সৃজনশীলতা হলো ‘বীজ’-এর মতো যা উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়। এ কারণেই উদ্যোগের প্রকৃতি হলো সৃজনশীলতা।
- **উদ্ভাবন (Innovation):** উদ্ভাবন হলো নতুন কিছু করার প্রক্রিয়া। যতক্ষণ না নতুন পণ্য-সেবা বা প্রক্রিয়াতে রূপান্তর করানো হচ্ছে— ততক্ষণ ধারণা না কল্পনার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ উদ্ভাবন হলো সৃজনী কল্পনার কার্যকর প্রয়োগ। তাই উদ্ভাবন ছাড়া উদ্যোগ সম্ভব নয়।
- **ব্যক্তিগত ধারণা (Individual Perception):** যে কোনো উদ্যোগের পিছনেই মূল শক্তি হিসেবে রয়েছে ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও উদ্যম। পৃথিবীর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড উন্নয়নে নেতৃত্বপ্রদানকারী ব্যক্তিগণ আমাদের মাঝে স্বরণীয় হয়ে আছেন। যেমন— ডাঃ মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, মোঃ জহুরুল ইসলাম, জামশেদজি টাটা, ধীরুভাই অম্বানী, হেনরি ফোর্ড, অকিও মেরিতা প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সফল উদ্যোগের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত ও পরিবর্তিত হয়েছে।
- **ঝুঁকি গ্রহণ (Risk-taking):** ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। উদ্যোগ হলো পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের ঝুঁকিবহুল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির ঐ গতিশীল প্রক্রিয়ায় বাজারগত পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সরকারি নীতি-পদ্ধতির সাথে সমন্বয় করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাকে ইকুইটি, সময় এবং নিজের জীবনধারার ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।
- **অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সন্ধান (Searching for Economic and financial opportunity):** মানুষের চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধান ও তার সদ্যবহারের মাধ্যমে উদ্যোগে সফলতা লাভের পূর্বশর্ত।
- **ধারাবাহিকতা (Continuity):** ব্যবসায় উদ্যোগ হলো এক কর্ম প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের কাজ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক চক্রের কাজ শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ছাড়া উদ্যোগ সফল হতে পারে না। সুতরাং কর্ম প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক এ ধারাবাহিকতা রক্ষা সফল উদ্যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- **ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি (Increase in individual and social wealth):** উদ্ভাবনী ও গঠনমূলক এবং সৃজনশীল কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করাই হচ্ছে উদ্যোক্তাদের বৈশিষ্ট্য। উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উপকরণসমূহ এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে ঐ সব উপকরণ থেকে উদ্যোক্তার নিজের উদ্যোগের এবং সমাজের মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
- **স্বাভাব্য (Independence):** প্রত্যেকটি উদ্যোগই একটা স্বাধীন সত্তা। উদ্যোক্তা থেকে উদ্যোগের সত্তা সম্পূর্ণ আলাদা। উদ্যোগের এ বৈশিষ্ট্যের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুযোগের সদ্যবহার, নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতি সব বিষয়েই উদ্যোক্তা নয় উদ্যোগই দায়ী থাকে।
- **গতিশীলতা (Dynamism):** উদ্যোগ হলো সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সন্ধান এবং তা কাজে লাগানোর এক গতিশীল প্রক্রিয়া। পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং সে অনুযায়ী কর্ম প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির পরিবর্তন উদ্যোগকে গতিশীল করেছে। সুতরাং, সম্পদ সৃষ্টির এক গতিময় প্রক্রিয়া হলো ব্যবসায় উদ্যোগ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্যোগ হলো দক্ষতা ও সক্ষমতার সংযুক্তিকরণ। অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুম্পিটার নির্দিষ্টভাবে উদ্যোগের বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে ঐকোনো কাজ সম্পাদনের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন ও অপেক্ষাকৃত ভালো পদ্ধতির প্রয়োগ প্রক্রিয়াই হচ্ছে উদ্যোগ।

ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি

একজন উদ্যোক্তা যে সকল কার্য সম্পাদন করেন তা নিজের সফলতা অর্জনে এবং সে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে করে থাকেন। তাই একজন সফল উদ্যোক্তা হতে হলে তাঁকে কতকগুলো গুণের বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। অর্থাৎ একজন দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ বিদ্যমান থাকবে, যা তাঁকে অন্য সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করে দেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী বিশ্লেষণ করে যে সকল গুণ পরিলক্ষিত হয়, তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- **ব্যক্তি-সামাজিক গুণাবলি** : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যে গুণের দ্বারা ব্যক্তি সমাজে বসবাসরত মানুষদের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায় বা সামাজিকীকরণ করে থাকে, তা ব্যক্তি সামাজিক গুণাবলি। সমাজ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এর অন্তর্ভুক্ত।
- **মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলি** : মানুষের ব্যক্তিত্ব, মেধা ও মননশীলতার সংমিশ্রণ হলো মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলি। এ গুণাবলি দ্বারা ব্যক্তি তাঁর চারপাশের অবস্থানরত মানুষের মাঝে নিজেকে বিকশিত ও পৃথক করতে পারে। সৃজনশীলতা, দূরদর্শীতা, মোহনীয় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি।
- **অর্থনৈতিক গুণাবলি** : অর্থনৈতিক কার্যাবলি অনুধাবন, বিশ্লেষণ, তুলনা, মূল্যায়ন, মিতব্যয়িতা, লাভ-ক্ষতি নির্ণয় ও ঝুঁকি মূল্যায়নের যোগ্যতা, মূল্য সংযোজন ঘটানোর জন্য উপকরণসমূহের সমাবেশ ঘটানোর যোগ্যতা, উপযুক্ততা নির্ধারণ, সঠিক বিকল্প বাছাইকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় নির্ণয় ইত্যাদি এ গুণের অংশ।
বিভিন্ন লেখক ও গবেষক উদ্যোক্তার যে সব গুণাবলির ওপর আলোকপাত করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ-
- **আত্মবিশ্বাস (Self Confidence)** : নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস এবং পরাজিত না হওয়ার মানসিকতাই আত্মবিশ্বাস। দক্ষতা এবং সক্ষমতা কোনো কঠিন কাজ করার মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। যেহেতু যে কোনো উদ্যোগই অনিশ্চিত ও ঝুঁকিবহুল সেহেতু উদ্যোক্তার আত্মবিশ্বাসী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় উদ্যোগে সফলতা অর্জন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
- **সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা (Creativity and Innovativeness)** : উদ্যোগ সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা। কোনো ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় তা নির্ধারণের জন্য উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি থাকা অত্যাৱশ্যক।
- **উদ্যম (Initiative)** : শুধু সৃজনশীলতা বা আত্মবিশ্বাসই একজন উদ্যোক্তার সফলতার জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলোর সাথে তার নতুন কাজে উদ্যম থাকাও অত্যন্ত দরকার। কোনো মানুষই উদ্যম ব্যতিরেকে উদ্যোগী হতে পারে না। উদ্যোগী নিজের উদ্যম প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে উদ্যোগকে সফল করে তোলেন।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তা (Decisiveness)** : সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে স্বল্পসময়ের মধ্যে উদ্যোক্তাকে বহুবিধ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তে অটল থাকার মানসিক দৃঢ়তা না থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্ভব নয় বিধায় উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ় মানসিকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।
- **অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা (Perseverance and Sincerity)** : সুনির্দিষ্ট ফল লাভের জন্য কোনো কাজে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকার মানসিকতাই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা উদ্যোক্তাকে হতাশ হতে দেয় না বিধায় তাকে সাফল্য লাভে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে।
- **মূল্যায়ন ক্ষমতা (Evaluation power)** : ঝুঁকি ছাড়া কোনো উদ্যোগ নেই। কিন্তু উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত মূল্যায়ন ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করতে সাহায্য করে। তাই সম্ভাব্য সুযোগের সুবিধা, বাজারের পরিস্থিতি, কর্মী মানসিকতা ও আত্মবিশ্লেষণ উদ্যোক্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ।
- **ত্যাগের ইচ্ছা (Will to Sacrifice)** : সব উদ্যোগই বহুবিধ বাধা ও অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঐ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নতুন উদ্যোগ গড়ার জন্য উদ্যোক্তাকে তার সময়, শক্তি ও সম্পদ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেই উদ্যোগ গড়ে তুলতে হয় বিধায়ই উদ্যোক্তার সম্পূর্ণ অঙ্গীকার প্রয়োজন।

- **স্বাধীন কিন্তু নমনীয় মনোভাব (Independent but flexible attitude) :** স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা থেকেই একলা চলার মানসিকতা গড়ে ওঠে যা মানুষের আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্বাধীন চিন্তা ও আত্মবিশ্বাস থেকেই উদ্যোগ স্পৃহা গড়ে ওঠে। সব উদ্যোক্তাকে নির্দিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে কাজ করতে হয় বিধায় উদ্যোক্তাকে নমনীয় হয়ে সমাজ ও পরিমণ্ডলের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।
- **ঝুঁকি গ্রহণের সাহস (Courage to bear risks) :** উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য হলো ঝুঁকি সম্পৃক্ততা। কিছু সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করে উদ্যোক্তা তাঁর প্রকল্প গড়ার ফলে উদ্যোক্তার জন্য সব সময়েই ঝুঁকি থেকে যায়। চালু পণ্যের বিকল্প অথবা নতুন পণ্য ভোক্তারা সাদরে গ্রহণ করবে কিনা সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। তাই পৃথিবীর সব স্বার্থক উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঝুঁকি গ্রহণের গুণ লক্ষ্য করা যায়।
- **প্রকল্পে আস্থা (Confidence in the project) :** প্রকল্পে প্রগাঢ় আস্থা ব্যতিরেকে উদ্যোগ সফল হয় না। নিজ প্রকল্পে আস্থার উপর ভিত্তি করেই উদ্যোক্তা তাঁর প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী, পাওনাদার, যোগানদার, ক্রেতা এবং কর্মচারীসহ সকলের বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। তাই নিজ প্রকল্পের উপর আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সমার্থক।
- **বিপণন দক্ষতা (Marketing Skill):** উদ্যোগে সফলতা লাভের জন্য উদ্যোক্তার বিপণন প্রতিভা থাকা অত্যাাবশ্যক। কেননা যে উদ্যোক্তা যত বেশি পরিমাণে বাজারের সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন সে উদ্যোক্তার সফলতা লাভের সম্ভাবনা তত বেশি।
- **নেতৃত্বদানের ক্ষমতা (Power of leading) :** নেতৃত্বদানের ক্ষমতা মানুষের এ পৃথক ধরনের গুণ। উদ্যোক্তার আবশ্যিক গুণাবলির মধ্যে এ গুণের স্থান অনেক উঁচুতে। উদ্যোক্তার বিচারশক্তি, দায়িত্ববোধ, বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালন ক্ষমতা এবং উদ্বুদ্ধ করার সমন্বয়ে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা গড়ে ওঠে।
- **দূরদর্শিতা (Farsightedness) :** দূরদর্শিতা থেকেই ঘটনা প্রবাহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে উদ্যোক্তা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনুমান করতে পারেন যা ভবিষ্যতে সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। উদ্যোক্তার এ দূরদর্শিতার কারণেই পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষ সর্বদাই তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নাগালের মধ্যে পেয়ে থাকে এবং উদ্যোগও সফলতা লাভ করে।
- **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব (Attractive personality) :** অনুসারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য উদ্যোক্তাকে সর্বদাই নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। তাই যাতে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার অধীনে কাজ করে আনন্দ লাভ করে সে জন্য উদ্যোক্তাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, একজন সফল উদ্যোক্তা বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা হতে হলে উপরিউক্ত গুণাবলি তাঁর মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে। যদিও এক সময় ধারণা করা হতো যে উদ্যোক্তা জন্মে, গড়ে না। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন উদ্যোক্তা যেমন জন্মগতভাবে সৃষ্টি হয়; তেমন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুকূল পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমেও উদ্যোক্তা তৈরি করা যায়।

৬.৩ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উর্ধ্বগামী প্রবণতার প্রক্রিয়াকে বুঝায় যাতে দীর্ঘমেয়াদে দেশের বিভিন্ন অর্থনীতির সূচক যেমন- মাথাপিছু আয়, কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার, জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপাদন এবং সামাজিক সূচক যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি একটা দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক সূচক বা অবস্থার টেকসই ক্রমাগত উন্নতিকে প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বলা যায়। বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ। আদমশুমারি ও গ্রহ গণনা ২০১১ অনুযায়ী ২০১২ সালে ১৬ জুলাই বাংলাদেশের অনুমিত জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার ১৫ জন। মোট জনসংখ্যার ৮০% গ্রামে এবং ২০% শহরে বাস

করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিভিউ ২০১১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ২০%, ৩০% ও ৫% ভাগ। যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পখাতসহ সব খাতেরই উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উদীয়মান বাঘ হিসেবে খ্যাত। বিশ্বের নামকরা অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ সেবা ও কৃষি খাত থেকে আসলেও শতকরা ৩০ ভাগ আসে শিল্প খাত থেকে। সেই দেশকে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশ বলা হয়, যার মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশির ভাগ আসে শিল্প খাত থেকে। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প খাতসহ সকল খাতের উন্নয়ন সম্ভব।

নিম্নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো:

- **সম্পদের সদ্যবহার**
দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যবসায় উদ্যোগ দেশে নতুন নতুন ব্যবসায় গঠন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।
- **মূলধন গঠন**
মূলধন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন বা নতুন কিছু উৎপাদন সম্ভব নয়। ব্যবসায় উদ্যোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- **জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি**
ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন [Gross Domestic Product (GDP)] ও মোট জাতীয় উৎপাদন [Gross National Product (GNP)] বৃদ্ধি পায়। ফলে, মোট জাতীয় আয় (Total National Income) বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মাথাপিছু আয়ও (Income Per Capita) বৃদ্ধি পায়।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**
বর্তমান উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকারের পুরোপুরি কর্মসংস্থানের দায়িত্বভার নেয়ার সুযোগ নেই। বরং রাষ্ট্র এরূপ সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাতে দেশে বেসরকারি মালিকানায নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা, ব্যবসায় ইউনিট গড়ে ওঠে এবং নিত্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর এটা ব্যবসায় উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়।
- **দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি**
বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগিত করে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়। জাপান এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- **পরনির্ভরশীলতা হ্রাস**
যে সকল পণ্য ও সেবাকর্ম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প, কল-কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করে ঐ সকল পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে পরনির্ভরতা দূর করা যায়।
- **শিল্পোন্নয়ন**
ব্যবসায় উদ্যোগের অর্থাৎ দক্ষ ও সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের দ্বারাই নতুন নতুন ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন, পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন ঘটে থাকে।
- **বিনিয়োগ বৃদ্ধি**
ব্যবসায় উদ্যোগের দ্বারা দেশে এরূপ ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়, যার ফলে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী নতুন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে।
- **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন**
ব্যবসায় উদ্যোগের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়।
- **প্রযুক্তির উন্নয়ন**
প্রযুক্তি সতত পরিবর্তনশীল। উন্নত গবেষণার মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগ বা উদ্যোক্তা ক্রমাগতভাবে লাগসই প্রযুক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহার করেন। ফলে দেশে প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়ন হয়ে থাকে।

- **সফল নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি**

ব্যবসায় উদ্যোগ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় যাদের মাধ্যমে নতুন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এতে দেশে উৎপাদিত কাঁচামালের সদ্যবহার নিশ্চিত হয়, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, জনশক্তির রোজগারের পথ সুগম হয় এবং আর্থিক ক্ষমতা বাড়ে। ফলশ্রুতিতে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

- **সুশম আঞ্চলিক উন্নয়ন**

ব্যবসায়ে উদ্যোগের মাধ্যমে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতা দূর করা যায় এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা যায়।

- **কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন**

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং তার মাধ্যমে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

- **গ্রামীণ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন**

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান আর্থিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

- **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন**

ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে গ্রামীণ জীবনে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

- **মনোভাবের পরিবর্তন**

ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক কার্যক্রম মানুষের মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটায়। এক সময়ে যে কাজকে মানুষ তুচ্ছ গ্ঞান করতো বর্তমানে সে কাজই সামাজিক মর্যাদা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষের মনোভাবের এ পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়- একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান কারণ ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা।

৬.৪ : ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক

মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ঝুঁকি বিদ্যমান। মূলত ব্যক্তি জীবন ও ব্যবসায়িক জীবনের অনিশ্চয়তার যে অংশটুকু আমরা পরিমাপ করতে সক্ষম সে অংশই আমাদের কাছে ঝুঁকি হিসেবে পরিচিত। ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক সর্বদা বিদ্যমান। কোনো ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম, আবার কোনো ব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুদি দোকানে ঝুঁকি কম তাই মুনাফাও সীমিত। ব্যবসায়ে যেমন অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে তেমনি অত্যধিক ঝুঁকিও আছে। পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্বানুমানের ফলাফলের সাথে প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে সর্বদাই কম-বেশি পার্থক্য থাকে। এ পার্থক্য বা বিচ্যুতিকেই ঝুঁকি বলা হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ আর ঝুঁকি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঝুঁকি ছাড়া ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ অসম্ভব। কেননা নতুন উদ্ভাবিত পণ্য বা সেবা ভোক্তা কর্তৃক গৃহীত হবে কিনা বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংগঠন সফলতা অর্জন করবে কিনা সে সম্পর্কে উদ্যোক্তা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। সুতরাং, ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের সাথে ঝুঁকি থাকবেই। তবে এ ঝুঁকির পরিমাণ যাতে সর্বোচ্চ রাখা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণকারীকে তৎপর হতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যথার্থভাবে পর্যালোচনা ও বিচারবিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক এইচ নাইট মুনাফার সঙ্গে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সম্পর্ক বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। এ তত্ত্ব অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। তাঁর মতে, “ঋণমুনাফা হলো অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার”। অনিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করেই অধ্যাপক নাইট মুনাফা তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছেন। তিনি বলেছেন, “ঝুঁকি বহন যে কোনো উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হলেও তাঁকে সব ঝুঁকি বহন করতে হয় না।” ঝুঁকিকে তিনি দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন। ঐ দুটি ভাগ হলো বিমায়োগ্য ঝুঁকি এবং বিমার অযোগ্য ঝুঁকি। যে সব ঝুঁকি পূর্ব থেকে অনুমান করা সম্ভব - সে সব ঝুঁকিকে বিমায়োগ্য

ঝুঁকি বলে। আবার যে সব ঝুঁকি পূর্ব থেকে অনুমান করা যায় না এবং ঐ ঝুঁকি এড়াবার জন্য বীমাও করা যায় না- সে সব ঝুঁকিকে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। বিমাযোগ্য ঝুঁকিকে নিশ্চিত ঝুঁকিও বলা যায়। যেমন- দুর্ঘটনা, পরিবহণ বিভ্রাট, চুরি, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি। বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ঐ সব ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, সরকারি নীতির পরিবর্তন, ক্রেতার চাহিদা পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্পর্কিত অনিশ্চিত ঝুঁকিসমূহ কেবলমাত্র উদ্যোক্তাকেই বহন করতে হয়। বিমা করে ঐ সব ঝুঁকি থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ঐ সব ঝুঁকি বিমাযোগ্য নয়। নাইটের মতে উদ্যোক্তাকে কেবল ঐ সব অনিশ্চিত ঝুঁকিই বহন করতে হয় এবং মুনাফা হলো ঐ সব অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। নাইট-এর অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব সাধারণভাবে অর্থনীতিতে গৃহীত হয়েছে কিন্তু এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সমালোচনাও রয়েছে।

ব্যবসায় স্থাপন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। অন্যদিকে ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে অধিক পরিমাণ আয় করাও সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন সফল উদ্যোক্তা সর্বদা ঝুঁকি আগেই নিরূপণ করেন এবং তা-হাসের ব্যবস্থা নেন এবং সবসময়ই পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করেন। মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি এবং অতি আত্মবিশ্বাস যে কোনো পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

ঝুঁকি গ্রহণ তত্ত্ব (Risk Taking Theory)

ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। যে কোনো সময় উৎপাদিত পণ্যের অথবা সরবরাহকৃত সেবার চাহিদা কমে যেতে পারে। এর ফলে অর্জিত মুনাফা কমে যেতে পারে। এই সম্ভাবনাই ব্যবসায়িক ঝুঁকি। অন্যদিকে দেখা গেল ব্যবসায় থেকে বছরে উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে কম মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এটিই হলো আর্থিক ঝুঁকি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রিচার্ড ক্যান্টিলন (Richard Cantillon) ও জন স্টুয়ার্ড মিল (John Stuart Mill) যৌথভাবে ঝুঁকি গ্রহণ তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হলো উদ্যোক্তাকে সব সময় মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি গ্রহণের মন মানসিকতা রাখতে হবে। কারণ এ ধরনের ঝুঁকি সে বহন করতে পারবে। যারা উচ্চ ঝুঁকি বহন করে তাদের দায়-দায়িত্বও বেশি। সুতরাং যে সব লোক ঝুঁকি নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

অর্থনীতিবিদগণের মতে, উদ্যোক্তাদের প্রধান কাজ হলো ঝুঁকি গ্রহণ করা। তবে মনস্তত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, উদ্যোক্তাদের ঝুঁকি গ্রহণের মধ্যে একটা পরিসীমা অর্থাৎ তারা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঝুঁকি গ্রহণ করবে। সুতরাং উদ্যোগ ও ঝুঁকি একে অপরের প্রতিচ্ছায়া। একটা থাকলে অপরটি থাকবেই। তা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যেকাজ করে সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণসাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৬.৫ : বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা

উদ্যোগসুলভ কার্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, দক্ষতা, নৈপুণ্য, ঝুঁকি গ্রহণের সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় ব্যবসায় উদ্যোগ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে বিরাজমান ব্যবসায় পরিবেশ ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকূল নয়। এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে যে বিষয়গুলো বাধার সৃষ্টি করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:-

● উদ্যোগ বিষয়ক ধারণাগত সমস্যা

আধুনিক যুগে ব্যবসায় উদ্যোগ দেশে শিল্পোন্নয়ন তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও প্রকৃত অর্থে উদ্যোক্তা বিষয়ক ধারণা এখনো পর্যন্ত সর্বমহলে সুস্পষ্টরূপে পরিচিতি লাভ করেনি। যদিও বিষয়টি অত্যন্ত আলোচিত এবং বিশ্বের প্রায় সব দেশের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ এখনো এর মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম হয়নি।

- **ব্যবসায় সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব**

উদ্যোক্তার উদ্ভাবনের সার্থকতা নির্ভর করে উদ্ভাবিত পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উপর। তাই একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় তথা শিল্প ও বাণিজ্য এবং এগুলোর সহায়ক বিষয়সমূহের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বাংলাদেশের জনগণ এ বিষয়ে অনগ্রসর বিধায় ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

- **ব্যক্তি পর্যায়ে ঝুঁকি গ্রহণে অনীহা**

ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি পর্যায়ে ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত পরিবেশে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করার মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, যার অভাব বাংলাদেশে প্রকট। যার ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

- **চাকরির প্রতি মোহ**

ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে— পরিবারে/সমাজে নিজের অধীনে নিজের কাজ নিজে করার মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের আধিক্য। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষই নির্দিষ্ট বেতনে অন্যের অধীনে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহের মনোভাবসম্পন্ন। যার ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

- **রাজনৈতিক অস্থিরতা**

রাজনৈতিক অস্থিরতা যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে পারে। ফলে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নিজস্ব গতিতে চলতে পারে না বিধায় সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণ অগ্রসর হওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে স্থবির হয়ে যান। ফলে বাধাগ্রস্ত হয় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

- **প্রচার-প্রচারণার অভাব**

যে কোনো পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রচার ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ সম্পর্কে যথেষ্ট ও কার্যকর প্রচার-প্রচারণা না থাকায় বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী ও বেকার যুবশক্তি এ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারছে না। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি সফলতা লাভ করতে পারছে না।

- **সরকারি নীতি**

দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টির পিছনে সরকারি সহযোগিতা ও নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অনুকূল সরকারি সহযোগিতা ও নীতির অভাবে বাংলাদেশে এখনো উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে না।

- **মূলধন গঠনে সমস্যা**

ব্যবসায় উদ্যোগ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে মূলধন। বাংলাদেশে মূলধন গঠনের হার এখনো অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে। সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত নিম্ন। তাছাড়া ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের অন্যান্য সম্ভাব্য উৎসগুলো এখনো খুবই দুর্বল। তাই প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের অভাবে উদ্যোগ গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

- **প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধার অভাব**

ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হচ্ছেন না।

- **সুষ্ঠু সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাব**

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনার প্রয়োজন। এর অভাবে বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লিখিত সমস্যাগুলো ছাড়াও প্রয়োজনীয় শিক্ষা, অবকাঠামোগত সুবিধা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অভাব ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতিকে ব্যাহত করছে।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনার দেশ। জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ দেশ। শুধু প্রয়োজন উদ্যোগ। উপরে উল্লিখিত বাধাসমূহ দূর করার ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে আসলে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধশালী দেশ হতে বাংলাদেশকে তেমন বেগ পেতে হবে না। বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধাসমূহ দূর করার জন্য নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক :

- সামগ্রিক ও বিস্তৃত এবং কার্যকর একটা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অর্থনৈতিক সুযোগ, সম্পদ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলাকে বিশেষ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা;
- বিদ্যমান সব সুযোগ-সুবিধা কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা নির্ধারণ করা;
- জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে চিহ্নিত অঞ্চলসমূহ থেকে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত ও বাছাই করা;
- ঐ সব সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আর্থিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজে আত্মনিয়োগের ব্যবস্থা করা;
- উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা রেখে একটা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে;
- প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে ঐ জেলার সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের বাছাই করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থানীয়ভাবে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা হলে উদ্যোক্তা উন্নয়নের কর্মসূচি সফল হবে;
- রাজনৈতিক বিবাদ, হরতাল, অবরোধ, শ্রমিক ও পরিবহন ধর্মঘটসহ সব রকম ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের ব্যবস্থা করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের বাধা দূর হবে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিময় হবে;
- ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন নামে একটা মন্ত্রণালয় স্থাপন করে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন ও সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। সে ব্যবস্থা ওয়ান স্টেপ সার্ভিস সিস্টেম এ নিয়ে আসা হলে উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচির যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হবে।
- অপরের অধীনে চাকরি করার সামাজিক মন-মানসিকতা পরিহারপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানমুখী মানসিকতা তৈরি করার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল ও ত্বরান্বিত

হবে। ফলে মানুষের মন মানসিকতার পরিবর্তন হবে যা উৎসাহী ব্যক্তিদের নিজের বুদ্ধি জ্ঞান, দক্ষতা ও অর্থ সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজে কিছু একটা করার জন্য উদ্ধুদ্ধ হবে।

- কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন করে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দিয়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে এবং দেশে শিল্প, কলকারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবে।
- আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে সফলতা অর্জনকারীদের নিয়ে টীম গঠন করে প্রতি উপজেলায় সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের জন্য নিয়মিতভাবে কর্মশালা আয়োজন করা হলে ব্যবসায় উদ্যোগ ধারণা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে এবং অনেক উৎসাহী মানুষ ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসবে।
- ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমন্বিত আকারে জনগোষ্ঠীকে কার্যকরভাবে জানাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ব্যবহার করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা ও কর্মশালা আয়োজন করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে দেশের ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

৬.৬ : উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থান

কোনো দেশেই অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনিতেই অর্জিত হয় না। এর পেছনে রয়েছে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন, অদম্য উৎসাহী ও সুযোগ সন্ধানী এবং ঝুঁকি গ্রহণকারী একদল মানুষের অবিরত কর্ম প্রচেষ্টা। এরা পরিবর্তনের প্রতিনিধি। এরা উদ্যোক্তা নামে পরিচিত। এ সব উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল, উদ্ভাবনী-চিন্তাভাবনা ও সাংগঠনিক কর্ম প্রচেষ্টার ফসলই হচ্ছে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কোথায় কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন এবং কিভাবে তা গঠন করা যায়- উদ্যোক্তাগণ এ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তাই ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে ব্যবসায় সংগঠন স্থাপনের প্রাথমিক কর্ম প্রচেষ্টাকে বুঝায়। এ প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদন ছাড়া কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে না। কাউকে না কাউকে এ প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদন করতেই হয় আর যিনি বা যারা এ কাজটা করেন তিনি বা তারা উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। সুতরাং ব্যবসায় সংগঠন স্থাপনের প্রাথমিক কার্যসমূহ উদ্যোক্তাই সম্পাদন করেন। উদ্যোক্তা ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তিনি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। তিনি কল্পিত বিষয়কে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন এবং অত্যাবশ্যকীয় উপদানসমূহ- যেমন- ভূমি, মূলধন, শ্রম সংগ্রহ, কাঠামোর আয়োজন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের অস্তিত্বকে দৃশ্যমান করে তোলেন। উদ্যোক্তা একজন দক্ষ সংগঠক। ব্যবসায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকা উৎপাদনের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন এবং পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাকে সফল করে তোলেন। মানুষ যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও চেষ্টায় নিজের সামর্থ্য অনুসারে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে তখন তাকে বলা হয় আত্মকর্মসংস্থান। নির্ধারিত বেতন বা মজুরির বিনিময়ে অন্যের অধীনে কোনো কাজে আত্মনিয়োগ না করে নিজের বুদ্ধি, জ্ঞানদক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সম্পদ ও সামর্থ্যকে পুঁজি করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করাই হলো আত্মকর্মসংস্থান। এভাবে মানুষ যখন কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে তখন সেটা হয় আত্মকর্মসংস্থান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- মাছের খামার, ফলের বাগান, সবজির ক্ষেত, গরু-ছাগলের খামার, পানের দোকান, মুদী দোকান, চায়ের দোকান, হাঁস-মুরগির চাষ ইত্যাদি সবগুলোই আত্মকর্মসংস্থান সমৃদ্ধ কর্মকাণ্ড। এ সবার জন্য বিপুল অংকের টাকা-পয়সা, বিভ্রাট আত্মীয়স্বজন অথবা অনেক জায়গা-জমির প্রয়োজন হয় না। যা প্রয়োজন তা হলো নিজের উপর অবিচল আস্থা, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি কাজে লাগানোর অদম্য ইচ্ছা ও সাহস। অন্যের অধীনে কাজ করার পরিবর্তে অন্যকে চাকরি দেয়ার মনোবৃত্তি এবং স্বল্প প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ, আত্মবিশ্বাস ও ঝুঁকি গ্রহণের

দৃঢ় মনোবল- এ কাজের প্রধান হাতিয়ার। এর মাধ্যমে গৃহিণীরাও ঘরে বসে হাঁস-মুরগি পালন, জামা-কাপড় তৈরি, চটের ব্যাগ, ছিকা বানানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে পারেন। অনুরূপভাবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন, বিত্তহীন, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবসমাজও স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজেই তৈরি করে সচ্ছল ও উন্নত জীবনযাপন করার ব্যবস্থা করতে পারে। সুতরাং আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, শক্তি, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, অর্থ সম্পদ ও ঝুঁকি গ্রহণের সাহস কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমৃদ্ধশালী জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিকে বুঝায়। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই এবং অতি ক্ষুদ্র হতেই বৃহৎ এর জন্ম- এ বিশ্বাসই আত্মকর্মসংস্থানকারীকে পথের সন্ধান দেয়, লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থহীন প্রণোদনা যোগায়।

উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক

(Relationship between Entrepreneurship and Self-Employment)

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেয় এবং তিনি সে পর্যন্ত সফল হন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত হবেন যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান। ব্যবসায় উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক বিদ্যমান। একটা অন্যটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক স্বপ্ন দেখে তা বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়ার নাম উদ্যোগ গ্রহণ আর নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত হলে তা পরিণত হয় আত্মকর্মসংস্থানে। সুতরাং বলা যায় উদ্যোগ গ্রহণের অপর নাম আত্মকর্মসংস্থান। তাই কর্মক্ষম মানুষদের যদি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে প্ররোচিত করা যায় তবে তারা মজুরি ও বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থানের আশায় বসে না থেকে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেই নিজের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে তৈরি করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। সাধারণত ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ, ব্যবসায় উদ্যোগ প্রেষণা সম্পর্কিত ধারণা প্রদান, বিনিয়োগ পরিবেশের উপদানসমূহের মূল্যায়ন, প্রকল্প নির্বাচন, কর্মী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, পণ্যমূল্য নির্ধারণ কৌশল, বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বর্ণনা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় পরিকল্পনা সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সব বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে একজন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে ঝুঁকি গ্রহণেও প্রণোদিত হয়। এভাবে ঝুঁকি নিয়ে উদ্যোগী হয়ে অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে স্ব-উদ্যোগে নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জীবিকা নির্বাহের কাজকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। যেমন- মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, নার্সারি, কুটির শিল্প, ফাস্টফুডের দোকান, শাক-সবজি উৎপাদন, কম্পিউটার ও ফটোকপি দোকান, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের উদাহরণ। ব্যবসায় উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়-

● অবস্থানগত পর্যায়

অবস্থানগত দিক বিবেচনায় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি প্রথম পর্যায়ের। আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহী ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন- তিনি কোন ব্যবসায় শুরু করতে চান, কিভাবে করতে চান, কোথায় করতে চান এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেন। সে পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের প্রথম অংশ। পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত ব্যক্তি যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ শেষ করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেন এবং আরো কিছু ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন তখন সেটা হয় ব্যবসায় উদ্যোগ, কেননা নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য, অর্থ সম্পদ সব কিছু ব্যবহার করে নিজের কাজ নিজে করার ক্ষেত্রে তৈরি করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।

● প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা : ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য ঝুঁকি নিয়ে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা ও অর্থ সম্পদ কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ আর এ প্রশিক্ষণই আগ্রহী ব্যবসায়ীকে উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধ করে।

- **আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি** : আত্মকর্মসংস্থান প্রক্রিয়া মানুষের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকশিত করে এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে যা তাদের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, জাতি ও দেশের জন্য কিছু করার কাজে আগ্রহী করে তোলে ফলে সৃষ্টি হয় ব্যবসায় উদ্যোগ।

- **পেশাগত দক্ষতা অর্জন** : জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে কোনো না কোনো পেশার সাথে যুক্ত হতে হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ প্রক্রিয়া মানুষকে উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক যে কোনো কাজ পরিচালনার জন্য পেশাগত শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কৌশল এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেয় যার ফলে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজে তৈরি করা অত্যন্ত সহজ হয়।

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রসার : নিজের মতো করে কিছু করার জন্য কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় যা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে শিক্ষা লাভের পর মজুরি ও বেতনে অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয় না। বরং এর ফলে দেশে শিল্প, কল কারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং দেশ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হয় যা দেশকে এক সময় সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করে।

আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

কোনো বিশেষ কাজ যথার্থভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। বড় প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠাগুলোর কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত। নিয়োগ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচি থাকলে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মীর জন্য প্রতিষ্ঠানকে বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। প্রশিক্ষণ হলো সর্বস্তরের কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতা বিকাশের অবিরাম ও নিয়মিত প্রচেষ্টা যাতে তাদের যোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানটিও লাভবান হয়। কোনো কর্মীকে সঠিক কাজে নিয়োগ করার পূর্বে তাকে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নতুন ও পুরাতন সকল উদ্যোক্তা ও কর্মীদের জন্যই অপরিহার্য।

- **সৃজনশীলতার উন্নয়ন**
ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সফলতা লাভের জন্য সব সময়ে প্রতিযোগী থেকে অগ্রগামী থাকা অত্যাৱশ্যক। এ জন্য প্রয়োজন নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ভাবনী শক্তি। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা একজন উদ্যোক্তাকে নতুন নতুন বিষয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করে। ফলে তাদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি**
প্রশিক্ষণে একজন সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কেননা প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং কাজে উৎসাহ যোগায়। তাই প্রশিক্ষিত ব্যক্তি অধিকতর দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে। ফলে প্রতিষ্ঠানের অপচয় হ্রাস পায় এবং পণ্য বা সেবার মান উন্নত হয়।
- **মনোবল বৃদ্ধি**
প্রশিক্ষণের ফলে উদ্যোক্তা ও কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে ওঠে। ফলে কাজের প্রতি তারা আন্তরিক হয়ে ওঠে এবং নিজেদের সম্মানিতভাবে যা সামগ্রিকভাবে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে।
- **যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার**
প্রশিক্ষণের ফলে উদ্যোক্তা এবং কর্মীগণ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির কাম্য ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয় যা প্রতিষ্ঠানের সফলতা বয়ে আনে।

- **সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি**

উদ্যোক্তাগণ সাধারণত সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ তাদের এ ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে তারা প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদ ও সুযোগসমূহের নতুন নতুন ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেন।

- **উৎপাদন ব্যয়-হ্রাস**

উদ্যোক্তাগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে যন্ত্রপাতিসহ উৎপাদনের অত্যাধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা সহজতর হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে যা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য অবদান রাখে।

- **সম্প্রসারণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন**

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সম্পদ ও সুযোগের নতুন নতুন ব্যবহারের ঝুঁকি ও সাফল্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্প্রসারণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়।

- **সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা**

প্রশিক্ষণের ফলে প্রতিষ্ঠানের সবার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের মনে করে। উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের মধ্যে এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাবের ফলে প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও কার্যকর কার্য পরিবেশ বিরাজ করে যার জন্য প্রতিষ্ঠানে এক স্থিতিশীল কার্য পরিবেশ বিরাজ করে যা সফলতা লাভের জন্য অত্যাবশ্যক।

- **ভবিষ্যত সুযোগ-সুবিধা অনুধাবন**

উদ্যোক্তা পরিবর্তনের প্রতিনিধি। বাজারে প্রতিযোগিতামূলক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য তিনি সব সময় দূরদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যত ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত করা হয় যা তাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **কার্যকর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা**

একটা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য একজন উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার নীতি-পদ্ধতি, পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল, নির্দেশ ও প্রেরণাদানের পদ্ধতি, সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পান বিধায় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গতিশীলতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় যার ফলে প্রতিষ্ঠানের সফলতা অর্জন নিশ্চিত হয়।

কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে দক্ষতা অর্জন করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রশিক্ষণ। ব্যবসায় উদ্যোগ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা মানুষ সব জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে জন্ম নেয় না। কোনো মানুষের মধ্যে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত গুণাবলির উপস্থিতি থাকতে পারে, কিন্তু তা সব সময় কর্মকাণ্ডে সফলতা অর্জনে কাজে নাও লাগতে পারে। প্রশিক্ষণ মানুষের সুপ্ত ক্ষমতাকে বিকশিত করে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী করে দেয় যা উদ্যোক্তাকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তার কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে এবং সফলতা অর্জন সহজ করে দেয়।

আত্মকর্মসংস্থানে সফলতা লাভের কয়েকটি উদাহরণ :



শুক্রবারের বিশেষ প্রতিবেদন।

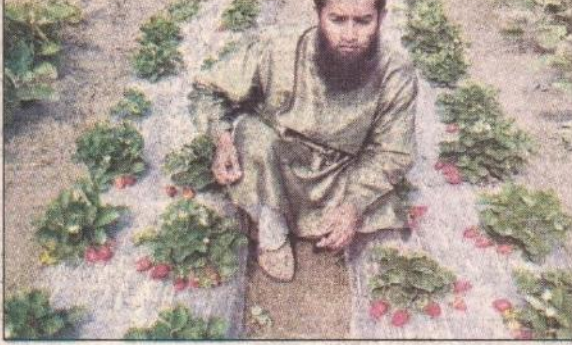
নাটোরে চাষাবাদ করেই কোটিপতি

২৭/১১/১৬
২০১৬

যুবক

মো. মাহফুজ আলম মুন্সী, নাটোর থেকে

মো. সেলিম রেজা। বয়স ত্রিশের কোটায়। নাটোর সদরের আহমেদপুর এলাকার মো. নাজিম উদ্দিনের ছেলে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাস্টার্স পাশ এই যুবক কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখেন ছোট বেলা থেকেই। একে একে চাকরি নেন সেনাবাহিনী, গৃহ কন্সট্রাকশন ও বীমা কোম্পানিতে। কোনো চাকরিই তার ভালো লাগে না। নিজেই কিছু করার চেষ্টা শুরু করেন। ২০০০ সালে সারা দেশের গৃহিণী বুদ্ধরোপণের সরকারি প্রচারণায় উৎসাহিত হয়ে ২ বিঘা জমিতে মৃতকুমারী, মিছরীদানা ও শতমূল চাষ করেন। ভালো উৎপাদন হলেও উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ভালো ব্যবস্থা না থাকায় গৃহিণী বুদ্ধ চাষ বন্ধ করে দেন। ২০০৪ সালে ৩৮ বিঘা জমিতে রোপণ করেন আপেল কুল। মাত্র তিন বছরেই আপেল কুলের গাছ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিনি কলম প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলোকে ধাই কুলে রূপান্তরিত করেন। কুলের চাইতে দাম বেশি হওয়ায় ২০০৬ সালে ৯ বিঘা জমিতে শুরু করেন ১২ মাসি পেয়ারা চাষ। কিছুদিন পরে অসময়ে বাঙ্গী, গ্রীষ্মকালীন পেয়ারা, লেবু, পেপে, ড্রাগন ও শরিফা চাষ শুরু করেন। বর্তমানে ৭০ বিঘা জমিতে তার এসব ফসল রয়েছে। এই ৭০ বিঘার মধ্যে ২৪ বিঘা জমি নিজের এবং ৪৬ বিঘা প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ হাজার টাকায় লিজ নেয়। তার এসব ফসল

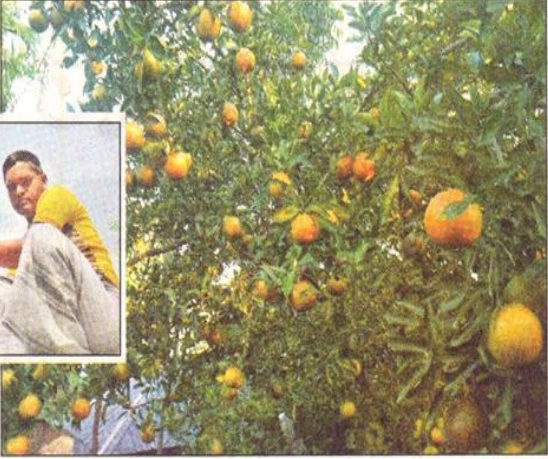


রক্ষণাবেক্ষণে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছে ২৮ জন শ্রমিক। ফসল তোলার মৌসুমে এখানে কাজ করে আরও শতাধিক শ্রমিক। এসব চাষাবাদের মধ্যে শরিফা ও ড্রাগন চাষে সে এখন ভীষণ মনোযোগী। সেলিম রেজা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় মাটিতে ব্যবহার করেন পচনশীল কৃষি প্রযুক্তি মালচিং পেপার যার এক পৃষ্ঠা সাদা ও অন্য পৃষ্ঠা কালো রংয়ের হয়ে থাকে। শীত প্রধান দেশে কালো পৃষ্ঠা মাটির উপরে এবং আমাদের দেশে সাদা পৃষ্ঠা মাটির উপরের দিকে রাখতে হয়। প্রথমে মাটিতে চাষ ও জৈব সার দিয়ে তৈরি করে মাটি ভালোভাবে মালচিং পেপার দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। পরে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণ করতে হয়। এতে মাটিতে খাবার ও সেচ কম লাগে, আগাছা জন্মায় না লেবার কম লাগে, পোকা মাকড়ের আক্রমণ কম হয় এতে মাটির আদ্রতা রক্ষাসহ ফসলের খাবারের প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে যে ড্রেন থাকে সেই ড্রেনের ভেতর সেচ দিয়ে ড্রেনের ভেতর খাবার প্রয়োগ করলে গাছ তা গ্রহণ করে। সেলিম রেজা মনে করেন, আমাদের দেশে এ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষাসহ অর্গানিক ও কম খরচে বিভিন্ন ফল, সবজি, ফুল যেমন-স্ট্রবেরি, পাতা ও বাঁধাকপি, বেগুন, শসা, করলা, পটল, পুই শাক, লেবু, শরিফা পেয়ারাসহ নির্দিষ্ট দূরত্বে সব ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। গত তিন বছর ধরে সেলিম তার খামারে পরীক্ষামূলক এ পদ্ধতির ব্যবহার করে আসছেন।

কমলা চাষে ভাগ্য বদল রাজ্জাকের

■ ফরহাদ আলম সুমন, লালমনিরহাট

হাতীবান্ধা উপজেলার বড়খাতা ইউনিয়নের একটি সবুজেরা গ্রাম পশ্চিম সারডুবি। এরই মধ্যে গ্রামটি নতুনভাবে পরিচিতি পেয়েছে কমলার গ্রাম নামে। গ্রামের প্রতিটি পরিবারই কমলা বাগান ও গাছ লাগিয়ে ভাগ্য বদলে ফেলেছে। সারডুবি গ্রামের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রাপ্ত' শিক্ষিকা ফাতেমা খাতুনের কমলা বাগান থেকে চারা সংগ্রহ করে ৪ বছর আগে বাড়ির আঙিনায় একটি কমলা চারা লাগান দিনমজুর আব্দুল রাজ্জাক। তা দেখে আনন্দের শেষ নেই তার পরিবারে। ঘরের চালে দুলছে কমলা। একটি কমলা গাছ দিয়ে তার পুরো সংসারের খরচ চলেছে। আব্দুল রাজ্জাক জানান, এ পর্যন্ত কমলা বিক্রি করে প্রায় ১০ হাজার টাকা পেয়েছেন তিনি। কমলা বিক্রি করে তেমন লাভ না হলেও কমলার বীজ সংগ্রহ করে চারা বিক্রি করলে প্রচুর টাকা আয় হয়। প্রতিটি চারা বিক্রি হয় ৫০ থেকে ১০০ টাকায়। প্রতিদিন কমলা খেতে অনেকেই বাড়িতে আসেন। হাতীবান্ধা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, 'ওই শিক্ষক দম্পতির পাশাপাশি সবাই কমলা চাষে এখন আগ্রহী। এ অঞ্চলের বেলে-দোআঁশ সমতল মাটিতে কমলা চাষে ব্যাপক সাফল্য আনতে পারে।'



গাছে থোকা থোকা কমলা। (ইনসেটে) চাষি আব্দুল রাজ্জাক

সমকাল

বৃহস্পতিবার

১ ডিসেম্বর ২০১৬ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩

বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে রাণীনগরের পেঁপে

■ আব্দুর রউফ রিপন, রাণীনগর (নওগাঁ) সংবাদদাতা

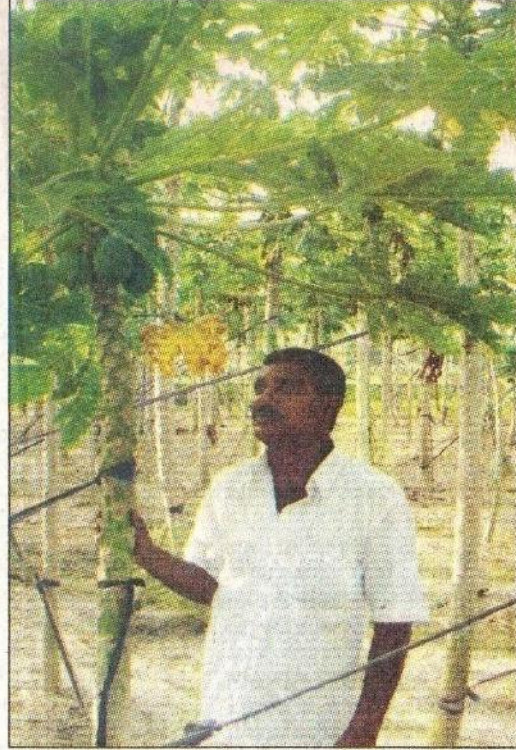
উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের মোঃ সাইদুর রহমান (৫০) পেঁপে চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার বাগানের চাষকৃত পেঁপে বর্তমানে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। দিগন্তজোড়া শুধু সবুজ পেঁপে গাছ আর প্রতিটি পেঁপে গাছে ঝুলছে থোকায় থোকায় পেঁপে।

সাইদুর রহমান জানান, তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে পেঁপে চাষ শুরু করেন। প্রথম দিকে তিনি ২ বিঘা জমি লিজ নিয়ে পেঁপে চাষ আরম্ভ করেন। বর্তমানে ১২ বিঘা জমিতে তিনি পেঁপে চাষ করছেন।

সাইদুর রহমান জানান, প্রতি মৌসুমে সকল খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ২ লাখ টাকা তার লাভ থাকে। এই মৌসুমে তিনি প্রতি মণ পেঁপে প্রায় ৮শ থেকে ৯শ টাকা বিক্রি করেছেন। যা অন্যান্য মৌসুমের তুলনায় অনেক ভালো দাম পেয়েছেন। তিনি পেঁপে চাষ করে আজ পরিবারের ছয় জন সদস্যকে নিয়ে সচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করছেন। তার বাগানে কর্মসংস্থান হয়েছে এলাকার অনেক বেকার যুবকের। তিনি জানান, সাম্প্রতিক ঝড়ে তার পেঁপে বাগানের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে অনেক পেঁপে গাছ উপড়ে গেছে। সরেজমিনে তার পেঁপে বাগান ঘুরে দেখা যায়, ঝড়ে পড়ে যাওয়া পেঁপে গাছগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সাইদুর রহমান জানান, কঠিন পরিশ্রম আর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতায় আজ তার পেঁপে চাষের এই সফলতা। তিনি জানান, কৃষি কর্মকর্তা তাকে সব রকম সহযোগিতা করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এস.এম গোলাম সারওয়ার জানান, পেঁপে চাষি সাইদুর রহমানের সফলতার পেছনে রয়েছে তার ঐকান্তিক নিরলস প্রচেষ্টা। তিনি রাণীনগরে পেঁপে চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন। তার দেখাদেখি অনেক যুবক এগিয়ে এসেছে।



রাণীনগর (নওগাঁ): নিজ পেঁপে বাগানে গাছের পরিচর্যা করছেন চাষি সাইদুর
-ইত্তেফাক

১৬০ টাকা থেকে কোটিপতি

গোলাম মওলা সিরাজ

চরভাঙ্গার বালুজমিতে সবুজের বিপ্লব ঘটায়ছেন নাজির হোসেন। খরস্রোতা নদীর দু'ধারে হেসে ওঠা চরে কলা চাষ করে তিনি এখন কোটিপতি। ধুর অতীত এখন তার কাছে শুধুই স্মৃতি। ১৬০ টাকা সুন্দর সফল করে কলা বিক্রি করে শুরু করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে নাজির হোসেন এখন কোটিপতি। সাক্ষাৎকার এ মানুষটি প্রবল ইচ্ছাশক্তি, শ্রম আর সততাকে পুঁজি করে চলেছেন সাক্ষরের দিকে। পাড়ে চারপাশ বিঘা (দেড়শ একর) জমিতে কলার বাগানে ৫০ হাজারেরও বেশি কলার চারা লাগিয়েছেন এই মহা। সঙ্গে কলাগাছের প্রতি দু'সারির মাঝখানে সারি করে লাগিয়েছেন ১০ হাজারের বেশি ইউকালিপটাস গাছ। একই সঙ্গে আমটো, পেঁপে, খিরচন্দ্র বিভিন্ন মৌসুমি সবজি লাগিয়েছেন তার কলা বাগানে। চল আসার আগেই কলা ব্যবসারীরা এই মহা তার বাগানের আগাম লম্ব হারিয়েছেন এক কোটি ২০ লাখ টাকা।

কিন্তু এখন নয়। ফল আসার পর কলা বেচেতে চান নাজির হোসেন। শুধু বকল নয়, তার এ পরিবারের মূল রয়েছে একটি মৎস উদ্যোগ। অর্জিত অর্থের অর্ধেক দিয়ে তিনি নিজ এলাকায় স্থাপন করতে চান একটি কুয়াশ্রম। শুধু কুয়াশ্রম নয়, শারাদেশের নদীর দু'ধারে বালুচরে সবুজের বিপ্লব ঘটতে চান তিনি। ব্রিটিশ আমলে ইস্পাতের তৈরি কুতুমামারীর সোনাহাট রিজের উঠে গোপে পাড়ে নাজির হোসেনের কলাবাগান। উত্তর দিকে চোখ ফেরালে মনে হবে বাগানের শেষপ্রান্ত যেন দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে। বৃষ্টি থেকে বেঁচে কলার বাগানে ঢোকার রাস্তার তলিয়ে যায় হাঁটু পর্যন্ত। পানিতে নর-মুন্ডার কুশ। খুশো গোরিয়ে সামনে এগোতেই চোখ পাড়ে নাজির হোসেনকে। বাগান পরিচর্যা কর। হাত চালাতে চালাতেই কথা বলছেন তিনি।



নিজ হাতে গড়া হাজার কলাবাগানে নাজির হোসেন

ছবি: দেবক

শুরু করা

অভাব-তন্দনে জর্জরিত ছিল বারার স্মার। ১৯৯৫ সাল। অত্যাধিকার পরিবার ও এলাকার মায়ী তাগ। করে নাজির হোসেন চলে যান চাইখাখের গাঁতালুও। জীবন ব্যাচাতে সেখানে শুরু করেন জাহাজ ভাঙার কাজ। কিন্তু জাহাজ ভাঙার কাজ করে খেয়ে-পরে বাড়িতে অর্থের জোপান দিতে পারতেন না। পরিশ্রম হতো খুব। দু'বছর পর সিরে আসেন কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার গঙ্গারহাট গ্রামের আমন চিকনায়।

গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে বাড়ি আসার পর নাজির হোসেন দু'দফা তার পকেটে আছে আর মাত্র ১৬০ টাকা। এটাই তার সফল। চোখের সামনে পরিবারের অভাবের দৃশ্য। কিছু একটা করবেন, কিন্তু সুন্দর কোথায়। ১৬০ টাকা নিয়েই বেঁচে মন বাড়ি থেকে। বাজার থেকে একটি বাঁশের চালি কিনে চলে যান কাউন্সেলিং হাটে। ১৬০ টাকার গালা কলা কিনে

মাথায় নিয়ে চলে আসেন পশুর নাগেরীর গালা বজারে। সব কলা বিক্রি করে কিছু টাকা লাভ হয়। এরপর মাথায় করে ঘুরে ঘুরে কলা বিক্রিই হয়ে গেল তার শেখ। স্মারের দেওয়ার পাশাপাশি অনেক কষ্টে কিছু সঞ্চয় করতে শুরু করেন নাজির হোসেন। বছর পাঁচেক চলা এভাবে। এরপর গঙ্গারহাট বজারে ছোট্ট একটি চাটের দোকান দিয়ে বসতলন একদিন। লোকসনে বিড়ুই, চা, পান, বিড়ি, সিগারেটের গুল কলাও বেচেতেন যাবারিটি। কিছুদিনের মধ্যে লোকসনের বিক্রি বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে চৈনিক আয়ের পরিমাণ। চাইল বাড়তে কলার। এক সময় মাথায় এগো, যদি কলা স্মারের চাষ করা যায় কেমন হয়! শুধু হেবে হাত ওঠিয়ে বসে থাকতেন না তিনি। বাড়ির বাড়িনা স্কলার আট শতক জমিতে শুরু করেন সবুজ কলার চাষ। পাছে কলা আসার সময় মনটা মত হয়ে তার, নিজের চাষ করা কলা লোকসনে বিক্রি করে

তুঁড়ির টেকর তোলায় মনে মনে। লাভও আসে দ্রিষ্ট। এভাবে বছর পাঁচ হতেই দেশে চাপল কলা বাগান করার। পাপের একবিঘা জমি এক বছরের জন্য দুই হাজার টাকায় নিজ নিয়ে তাতে কলার চারা লাগান নাজির হোসেন। প্রথম বছরই আয়ের হিসেব তাকে স্নে দেখাতে শুরু করে। তরপার থেকে আর শেখেন তাকতে হয়নি।

চরে চরে সবুজের বিপ্লব

এর মধ্যে চরভাঙ্গার বেলে মাটিতে সবুজের বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন নাজির হোসেন। নদী তালন কলিতে এলাকা কুড়িগ্রামের উত্তর ধলার তিন উপজেলা নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রামের ও ফুলবাড়ীতে অসংখ্য গ্রেডেন্সি নদ-নদী এখোঁকে চলে গেছে এদিক-ওদিক। প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদীতে বিলীন হয়ে যায়। একই সঙ্গে হ্রুঁতের বাতরিক নিয়ে

প্রতি বছর অপর প্রান্তে জেগে ওঠে বালুচর। নাজির হোসেন বলেন, নদীমাতৃক এ দেশে অসংখ্য চর। এ চরে বেটে চাষাবাদ করতে চায় না। কারণ পরিশ্রম বেশি। ফুলবাড়ীর ফল হয় না। সে কারণে চরভাঙ্গা পতিত থেকে যায়। এই চরভাঙ্গাতে অধি সবুজের ফিরে ঘটাতে চাই। যেখানে হাজার হাজার মানুষের কর্মসম্মান হবে। চরের জনবানি জমিলোকে অবদান করে তোলাই আমার লক্ষ্য। নিজের জমি নেই। সে জন্য নিজ নেওয়া জমিই তার ভরসা। তাহলে উঁক অবদান জমির মালিকরা তাদের জমি ভাড়া দিতে চান না। আর চাইলেও ভাড়া ইতান অনেক বেশি। নদীতীরের কলা বাগানের সব জমি তার নিজ নেওয়া। প্রতি বিঘা জমি দুই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকায় ভাড়া নিয়েছেন বছরমেয়াদি চুক্তিতে। তবে জমি মালিকের সঙ্গে চুক্তি আছে আট বছরের। নাগেশ্বরী উপজেলার কলিরহাটের চর, চান্দীবাজার চর,

কুড়িগ্রামের উপজেলার কাউকুটির চর ও কলিয়ার চরে তার দিগন্ত জোড়া কলার বাগান। বিস্তীর্ণ অঞ্চলভূতে কেবল সবুজ আর সবুজ। ১০ জন শ্রমিক মাসিক বেতনে কাজ করে নাজির হোসেনের কলার বাগানে। মাসশেষে ১০ জন শ্রমিককে ৪৫ হাজার টাকা বেতন দিতে হয়। এ ছাড়াও চৈনিক মজুরি হিসেবে প্রতি মাসে পাড়ে আরও দেড়শ শ্রমিকের মজুরি দিতে হয়। সার, সের, কীটনাশকসহ অন্যান্য খরচও রয়েছে। প্রতি মাসে খরচ হয় এক লাখের বেশি। অনেক সময় শুভা সুনে খণ নিতে হয় তাকে। কখনও বালিতে চড়া দূমে সার ও বীটনাশক কিনতে হয়। বাগানে সারের বস্ত্র এক হাজার টাকা দাম হলেও বালিতে নেওয়ার সময় এক হাজার ৫০০ টাকা দিতে হয়। এতে লাভের অঙ্কটা কমে যায়। তাই কৃষি গোনের জন্য স্থানীয় বাজারে ধর্না দিয়েছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু তাকে যেন কৃষক

মাল্টা চাষে ভাগ্য ফিরছে বেকার যুবকদের

এসএম পারভেজ, পিরোজপুর থেকে

এক সময় উপকূলকে এক ফসলি জমির অঞ্চল বলা হলেও সেই অপবাদ এখন অনেকটাই ভ্রম বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন পিরোজপুরের বেকার যুবকরা। এক ফসলি (ধানী ফসল) জমিতে তারা এখন বিকল্প পদ্ধতিতে জমির পাড় উঁচু করে আবাদ করছেন সুস্বাদু ফলদ বৃক্ষ, সবজি, মরিচের। ফলে একই জমিতে একই সময় তারা পাচ্ছেন একাধিক ফসল।

জেলা সদর ও নাজিরপুর উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসলি জমিতে এখন আর এক ফসলি ধান নয়, কয়েকগুণ বেড়েছে ফলদ বৃক্ষের পাশাপাশি সবজি ও মৎস্য চাষের দিকে। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে মাল্টা চাষ। বিভিন্ন প্রজাতির মাল্টা চাষ করছেন বেকার যুবকরা, যারা

আগে চাকরির আশায় ঘুরতেন। মাল্টা চাষ করে তারা এখন স্বাবলম্বী। অন্য বেকারদেরও উৎসাহ দিচ্ছেন মাল্টা চাষ করতে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ইতিমধ্যে পিরোজপুরকে ৬০টি মাল্টা বাগান এবং আটটি মাল্টা গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্প্রতি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন তালুকদার, জেলা বাজার কর্মকর্তা আবদুল মান্নান



হাওলাদারসহ কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ডাকাতিয়া গ্রামের আদর্শ কৃষক রেবতী সিদ্দিকারের মাল্টা বাগান ঘুরে দেখেন। মাল্টা চাষী রেবতী (৩৮) যুগান্তরকে জানান, তার অভিজ্ঞতার কথা। এইচএসসি পড়াকালীন বাবাকে হারান তিনি। সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন বাবা খগেন্দ্রনাথ সিদ্দিকার। ফলে সংসারের বোঝা বইতে লেখাপড়া বন্ধ

করে বাবার নেশার মতো তিনিও ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করেন। সাইনবোর্ড, ব্যানার ও দেয়াল লিখনসহ বিভিন্ন অংকন করে যা আয়-রোজগার তা দিয়ে রেবতী সংসার চালাতে। একপর্যায়ে দুর্গাপুরের বিভিন্ন গ্রামে মাল্টার বাগান সৃজনের কথা শুনে সখা হল তিনিও বাড়ির আঙিনায় গাড়ে তুলবেন মাল্টার স্বপ্নের বাগান। বাগানের নেশা এমনভাবে তাকে আকৃষ্ট করে বসল যে, ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র ১৫ শতক জমিতে হাত দিলেন মাল্টা চাষে। জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলা থেকে বারী-১ ও ইন্ডিয়ান জাতের ৫০টি গাছ ক্রয় করেন, যার প্রতিটি চারার মূল্য ছিল ১৬৫ টাকা করে।

বাগান তৈরিতে রেবতীর ওই সময় মোট ব্যয় হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার টাকা। রেবতীর বাগানে

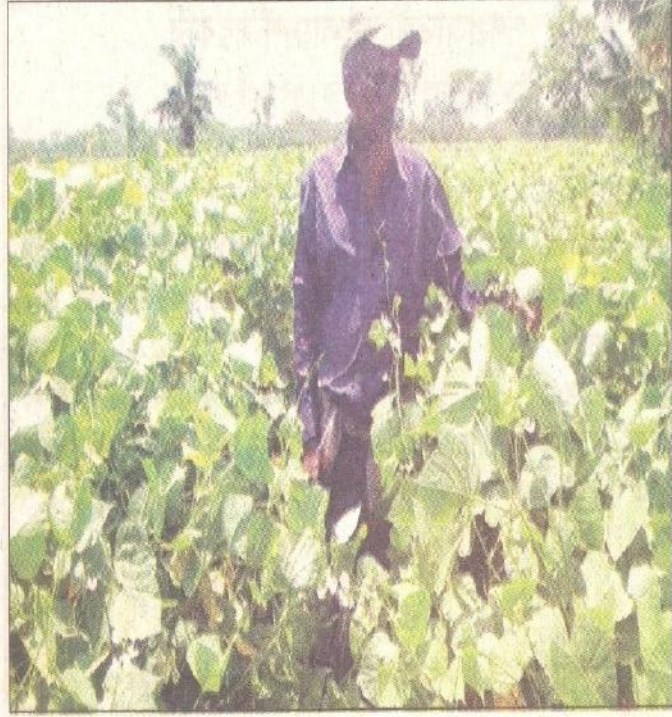
পেঁপে চাষসহ নানা সবজির চাষ হয়। মাল্টা চাষী রেবতী আরও জানান, তার বাগানে প্রায় ৪শ' মাল্টার নার্সারি রয়েছে, প্রতিটি চারা বিক্রয় করেন ১শ' ৫০ টাকা দরে। তিনি ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে নার্সারি শিল্প গড়ে তোলার প্রত্যয়ের কথা জানানলেন। এ বছর তার বাগানে উৎপাদিত মাল্টার আকার, বাহারী রং আর স্বাদ যে কোনো মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

অসময়ে শিম চাষে লাখপতি মেহেরপুরের কৃষক সামাদ

■ মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের আব্দুস সামাদ অসময়ে শিম চাষ করে লাখপতি হয়েছেন। জানা গেছে, সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামের রাহেল উদ্দিনের ছেলে আব্দুস সামাদ অন্যের কাছ থেকে ১৪ কাঠা জমি লিজ নিয়ে গত আষাঢ় মাসে শিম লাগান। শিমের পূর্ণ মৌসুমে প্রায় ৬০ হাজার টাকার শিম বিক্রি করেছেন। চৈত্র মাসে শিমের গাছ কেটে ফেলার কথা; কিন্তু তিনি শিম গাছ কেটে না ফেলে আবার ঐ গাছের যত্ন নিতে শুরু করেন। কিছুদিন পর গাছ নতুন করে ফুল আসতে শুরু করে এবং প্রচুর পরিমাণ শিম ধরে।

কৃষক সামাদ জানান, অসময়ে শিম বিক্রি করতে পারে নিজের যেমন ভালো লাগছে, তেমন মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় সবজির ঘাটতি পূরণ হচ্ছে। তিনি বলেন, গাছের যে তরতাজা চেহারা তাতে মনে হচ্ছে সারা বছরই শিম বিক্রি করতে পারবে। তিনি জানান, ১৪ কাঠা জমিতে শিম চাষে খরচ হয়েছে ১৩ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত তিনি শিম বিক্রি করেছেন প্রায় লাখ টাকার।



মেহেরপুর: নিজের শিম ক্ষেতে সফল কৃষক আব্দুস সামাদ

ইত্তেফাক

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য কী?
- উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য কী?
- ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
- উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ক. উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
- খ. আত্মকর্মসংস্থানে জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
- ২.ক. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করুন।
- খ. উক্ত বাধাগুলো দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো সনাক্ত করুন।

ইউনিট ৭ : ব্যবসায়ের আইনগত দিক

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যক্তির যে কোন ব্যবসায় করার অধিকার রয়েছে। তবে সেটা দেশের প্রচলিত আইনে স্বীকৃত ও বৈধ হতে হবে। এই বৈধতা প্রমাণের জন্য দেশের আইনের যোগসূত্র রয়েছে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য যদি দেশের আইন বিরুদ্ধ হয় তবে তা ব্যবসায় হতে পারে না। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতেও আইন মেনে চলতে হয়। এ ইউনিটে ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইনগত দিকসহ নিম্নোক্ত দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে-

- ৭.১ ব্যবসায় আইনগতদিকের ধারণা
- ৭.২ ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব
- ৭.৩ ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি
- ৭.৪ নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ
- ৭.৫ নেতৃত্বের গুণাবলি
- ৭.৬ ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

৭.১ ব্যবসায়ের আইনগতদিকের ধারণা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আর ব্যবসায় হতে হবে বৈধ ও জনকল্যাণমুখী। এই বৈধতার বিষয়টি আইনের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসায়ীকে আইনের বিভিন্ন বিধি বিধান মেনে চলে ব্যবসায় করতে হয়। অবৈধ ব্যবসায়ী নিজের সাময়িক সুবিধা পেলেও তার কর্মকাণ্ডে দেশ তথা গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসায় চালাতে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয়। নির্ধারিত পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য BSTI-এর অনুমোদন লাগে। একজনের বা এক প্রতিষ্ঠানের পন্য অন্য প্রতিষ্ঠান হুবুহু নকল করে ছাপিয়ে বাজারজাত করা আইনের পরিপন্থী। গার্মেন্টস বা যে কোনো শিল্পে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ। এটা মেনে ব্যবসায় করতে হবে। ইট ভাটায় অধিক পরিবেশ দূষণ হয় এমন চিমনি ব্যবহার করা যাবে না। তদ্রূপভাবে শিল্প বর্জ্য শোধন করা, ভেজাল পণ্য বিক্রয় না করা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রয়োগ করা হয়। যা বৈধতার সাথে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনায় মেনে চলতে হয়। এধরনের বিভিন্ন আইন মিলিয়ে ব্যবসায়ের যে আইনগত দিক রয়েছে তাই হলো ব্যবসায়ের আইনগত দিক।

লাইসেন্স

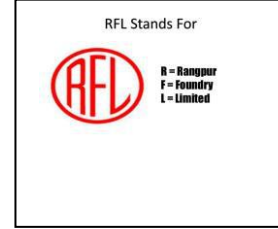


যে কোনো ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া বা নিবন্ধন করতে হয়। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ব্যবসায় করতে হলে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ের অনুমোদন বা নিবন্ধন করার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে। এক মালিকানা ব্যবসায়ের অবস্থান পৌর এলাকার ভিতর হলে পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধন যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবে ইচ্ছা করলে অংশীদারগণ আবেদন ফরমের সাথে নির্দিষ্ট হারে ফিস জমা দিয়ে অংশীদারী আইনের নিয়মানুসারে নিবন্ধন ফরম পূরণ করে স্থানীয় নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে পারে।

পেটেন্ট

পেটেন্ট হচ্ছে এক ধরনের মেধা সম্পদ। পণ্য বা সেবা আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে পেটেন্টের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া মালিকানা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্যের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকের সাথে সরকারের চুক্তি হয়। আবিষ্কারককে পেটেন্টটি প্রদানের অর্থ হলো উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্য কেউ এটি তৈরি, ব্যবহার এবং বিক্রয় করতে পারবে না। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী বা প্রতিযোগী বিধি লঙ্ঘন করে নকল পণ্য বাজারে বিক্রি করে আবিষ্কারককে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পেটেন্টের মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রযুক্তি ও শিল্পের উন্নয়নে আবিষ্কারককে উৎসাহ প্রদান করা এবং পরিশ্রমলব্ধ উদ্ভাবন নকল বা অন্য কোনো উপায়ে তৈরি বা বিক্রি করে যাতে আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশে ১৯১১ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন প্রচলিত রয়েছে।

ট্রেডমার্ক



এই ছবিগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক দেখানো হয়েছে যা একটির সাথে অন্যটির মিল নেই। ট্রেডমার্ক আইন দ্বারা এই প্রতীকগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। ঠিক একইভাবে সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীককে সার্ভিসমার্ক বলে। মার্ক বলতে কোনো নিশানা, ছাপ বা চিহ্নকে বুঝায়। বাংলাদেশে প্রচলিত ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক আইনে মার্ক বলতে কোনো ডিভাইস (device), ব্রান্ড (brand), শিরোনাম (heading), লেবেল (Label), টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, প্রতীক, সংখ্যা, সংখ্যায়ুক্ত উপাদান, রঙের সমন্বয় বা এগুলোর যে কোনো রূপ সমন্বয় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য মোড়ক পণ্য প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুবিধার্থে একাধিক শাখা অফিস রয়েছে। এ অফিসগুলো ট্রেডমার্ক নিবন্ধনসহ এ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করে।

কপিরাইট

কপিরাইট হচ্ছে এক প্রকার স্বত্ব। যা মালিকের সম্পত্তি। অর্থাৎ এটা এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যা তার সৃষ্টিকর্মের ওপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও গবেষণালব্ধ সৃষ্টিকর্মকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি হিসেবে ধরা হয়। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধা সম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, সাহিত্যিকর্ম, নাট্যকর্ম, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, স্থাপত্যকলা ইত্যাদি কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কপিরাইট চুক্তিপণ্য বজারজাতকরণের একটি জনপ্রিয় উপায়। বিভিন্ন ব্যান্ডের পণ্য খেলা, তারকাদের নাম প্রভৃতি কপিরাইট চুক্তির মাধ্যমে বিপণন করা যায়। কপিরাইটের যিনি মালিক, এই অধিকারসমূহ তিনি এককভাবে ভোগ করে থাকেন। অন্য কেউ এই অধিকার রাখেন না। যদি কেউ এই অধিকার ভঙ্গ করে কোনো কর্ম প্রকাশ করে, তাহলে সেটা অধিকার ভঙ্গকারী ব্যক্তির দণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী হবেন। উপমহাদেশে ১৯১২ সালে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশে বর্তমান আইনটি কপিরাইট আইন ২০০ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এটি ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়। এর পর ২০০৫ সালে ১৫ মে এই আইনটি জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ১৮ মে ২০০৫ এ আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায়গুলো ঠিকমতো ব্যবহার করলে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কপিরাইট আইন ২০০৫ অনুযায়ী লেখক বা শিল্পীর জীবনকালীন ও মৃত্যুর পর ৬০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে।

বিমা

ব্যবসায়ে বিভিন্ন কারণে ক্ষতির সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নানা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, অগ্নি, নৌ বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমা হলো মানুষের জীবন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এসব বিপদ বা ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা কোম্পানির সাথে বিমা গ্রহীতার নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিধিমে বিমার বিষয়বস্তুর উপর যে চুক্তি হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে। ক্ষতিপূরণের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বিমাকারী ও যাকে ক্ষতিপূরণের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা গ্রহীতা বলে। এটি চুক্তি অনুযায়ী বিমা গ্রহীতা বিমাকারীকে এককালীন বা নির্দিষ্ট পরিমাণ যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে। বিমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলে। এটি এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এখানে বিমার যাবতীয় শর্ত লেখা থাকে। মোট কথা বিমা হলো ঝুঁকির বিপক্ষে এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা যা প্রিমিয়ামের বিধিমে বিমাকারী কোম্পানি গ্রহণ করে থাকে। শুরুতে এ উপমহাদেশে ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের আওতায় বিমা চুক্তি গঠন ও পরিচালিত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বিমার ব্যাপক প্রচলন ঘটায় পৃথক আইনের প্রয়োজন হয়। এ কারণে ১৯১২ সালে উপমহাদেশে স্বতন্ত্র দুটি আইনের স্থলে The Insurance Act 1938 সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। যা বিমা আইন ২০১০ নামে পরিচিত।



বিমার প্রকারভেদ

বিমা কোম্পানিসমূহের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিমার প্রচলন হয়েছে। এর মধ্যে জীবন বিমা, নৌ বিমা, অগ্নি বিমা ও দুর্ঘটনা বিমা। এছাড়া আরো কয়েক শ্রেণির বিমার উদ্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে মোটর গাড়ি বিমা, শস্য বিমা, বিমান বিমা ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি বিমা আলোচনা করা হলো।

জীবন বিমা

মানুষের জীবনের উপর গৃহিত বিমাকে জীবন বিমা বলে। আধুনিক বিশ্বে যত প্রকার বিমা রয়েছে তার মধ্যে জীবন বিমা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ চুক্তির মাধ্যমে জীবনের ক্ষতিপূরণ সম্ভব না হলেও জীবন বিমার শর্তানুযায়ী বিমাকারী বিমা গ্রহীতার একটি নির্দিষ্ট সময় পর বা মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে। প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা এবং শর্তের তারতম্য অনুসারে জীবন বিমা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন আজীবন বিমা মানুষের মৃত্যুকাল পর্যন্ত করা হয়। মেয়াদি বিমা নির্দিষ্ট বয়সকাল বা নির্ধারিত সময়ের জন্য করা হয়।

অগ্নি বিমা

অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যে বিমাচুক্তি সম্পাদন করা হয় তাকে অগ্নি বিমা বলে। সাধারণত পণ্য দ্রব্য, ঘরবাড়ি, গুদাম, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সম্পত্তি আগুনে পুড়ে গেলে যে ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণের জন্য অগ্নিবিমা করা হয়।



নৌ বিমা

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশ পণ্যই নৌ পথে পরিবাহিত হয়। আর এই নৌ পথে চলার সময় নানাবিধ বিপদেও ঝুঁকি থাকা স্বাভাবিক। তাই নৌ পথে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি এড়াতে নৌ বিমা করা হয়। এটি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এ বিমার চুক্তি অনুযায়ী নদী ও সমুদ্র পথে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

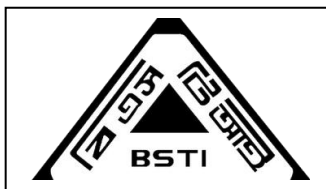


দুর্ঘটনা বিমা

এটি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির বিপক্ষে বিমা করা হয়। অর্থাৎ এ জাতীয় বিমার শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে বিমা গ্রহীতার বা তার সম্পত্তির দুর্ঘটনার কারণে কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (Bangladesh Standards and Testing Institution-BSTI)



১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি ১৯৭১ সালে এর পটপরিবর্তন করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউট হিসাবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট এ রূপান্তর করা হয়। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংস্থা। খাদ্য দ্রব্য, কৃষি পণ্য, রাসায়নিক, পাট বস্ত্র, বিদ্যুৎ, প্রযুক্তি ও কৌশল এ ছয়টি ক্যাটাগরির ১৪৫টি পণ্যের জন্য বিএসটিআই এর লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এ সকল পণ্যের নির্ধারিত মান কেমন তা বিএসটিআই থেকে জানা যায়। নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না করলে বিএসটিআই কর্তৃক ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানের সংগে খুলনা ও চট্টগ্রামের কৃষিপণ্য রপ্তানির দুটি ল্যাবরেটরি যুক্ত করা হয়। ঢাকা ছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোতে বিএসটিআই-এর শাখা খোলা হয়েছে। গ্রাহকের সুবিধার্থে তেজগাওয়ে বিএসটিআই-এর কেন্দ্রীয় ভবনের সামনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে। যাতে নাগরিকরা এখান থেকে বিএসটিআই সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও সুবিধা নিতে পারে।

উপরোক্ত ব্যবসায়ের আইনগত দিক ছাড়াও কারখানা আইন, শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও ব্যাংকিং আইন রয়েছে। যা জানা থাকলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা করা সহজ হয়।

৭.২ ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা

ব্যবসায় পরিকল্পনার আলোচনার পূর্বে পরিকল্পনা কী সে সম্পর্কে জানা দরকার। পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে কী করা হবে সে সম্পর্কে অগ্রিম চিন্তাভাবনা। সাধারণ অর্থে কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য ধারাবাহিক পূর্ব প্রস্তুতি হচ্ছে পরিকল্পনা। অর্থাৎ কখন, কোথায়, কিভাবে কারা কাজটি করবে সেটি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করাও সম্ভব হয় না। তাই ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে বুঝি ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। ব্যবসার লক্ষ্য অর্থাৎ মুনাফা অর্জন ও ভোক্তাদের সেবা প্রদান, অর্থায়নের উপায়, ব্যবসায়ের সার্বিক অবস্থার চিত্র এর মাধ্যমে জানা যায়। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কেমন, ভবিষ্যতে কোনো দিকে অগ্রসর হবে ও ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ব্যবসায় পরিকল্পনায় পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ব চিত্র বা নকশা নির্ধারণকে ব্যবসায় পরিকল্পনা বলে।



ব্যবসায় পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটা ধারণা মডেল

ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব

একজন ব্যবসায়ীকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। নতুন ব্যবসায় শুরু করা, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা, ব্যবসায় সম্প্রসারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন দিক থেকে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- **ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জন**
ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এই উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবসায় পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে করণীয় দিকগুলো পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **ব্যবসায় পরিচালনার দিক নির্দেশনা**
ব্যবসায় পরিকল্পনায় একজন ব্যবসায়ীর নিকট দিক নির্দেশক দলিল হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ব্যবসায় কী ধরনের কখন, কিভাবে ও কত সময়ের মধ্যে শেষ হবে ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসায় পরিকল্পনা দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে।
- **মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ**
ব্যবসায় শুরু করার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে প্রথমেই মূলধন সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগ করতে হয়। কোনো ব্যবসায়ের যখন অধিক মূলধনের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন অনেক সময় নিজস্ব তহবিল থেকে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বিধায় ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে মূলধন সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- **ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ**
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ও সেগুলো মোকাবিলায় পছন্দসমূহ বিশ্লেষণ করে ব্যবসায় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমিয়ে এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা সহজ হয়।
- **ব্যয় ও অপচয় হ্রাস**
ব্যবসায় পরিকল্পনার ফলে বাছল্য ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পায়। ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত মানবীয় ও বস্তুগত উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহারে অপচয় হ্রাস করতে ব্যবসায় পরিকল্পনা সাহায্য করে।
- **সরকারি সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার**
ব্যবসায় পরিকল্পনা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়গুলোর সরকারের নিকট থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা**
ভোক্তার চাহিদা বুঝে ভবিষ্যতে কী ধরনের পণ্য উদ্ভাবন করা উচিত, কোন ব্যবসায় বেশি লাভজনক এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যবসায় পরিকল্পনা সহায়তা করে।

৭.৩ ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের উপর। পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাবই হলো প্রকল্প। ব্যবসায় প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো ব্যবসায়ের ধারণা চিহ্নিতকরণ এবং ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে একটিকে নির্বাচন করা।

১. প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ

একজন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার প্রকল্প ধারণা অনুভব করার সময় থেকেই। তিনি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো পণ্য বা সেবার চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। এই চাহিদার উপর প্রকল্প নির্বাচন নির্ভর করে। সাধারণত পণ্য বা সেবা সামগ্রীর চাহিদা প্রকল্প ধারণার জন্ম দেয়। পণ্যের ধারণা থেকেই প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। প্রকল্প ধারণা চিহ্নিত করার সময় উদ্যোক্তার নিজের শখ বা আগ্রহ আছে এমন পণ্য, প্রকৃত চাহিদা আছে এমন পণ্য, বিদ্যমান পণ্যের অসুবিধা, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নতুন প্রকল্প ধারণাগুলোর উৎস সাধারণত নিজের কল্পনা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা, অর্থনৈতিক ও শিল্প জরিপ প্রতিবেদন, গবেষণামূলক প্রতিবেদন ইত্যাদি।

২. ধারণা মূল্যায়ন ও প্রকল্প নির্বাচন

একজন উদ্যোক্তা বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সম্ভাব্য ধারণা চিহ্নিত করে একটি তালিকা করবেন। এ তালিকাবদ্ধ ধারণাগুলো বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচন করবেন। দুইটি পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিত ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে প্রকল্প নির্বাচন করা যায়। এর একটি হলো ম্যাক্রোস্কিনিং এবং অন্যটি হলো মাইক্রোস্কিনিং।

ক. ম্যাক্রোস্কিনিং

ম্যাক্রোস্কিনিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যা কতকগুলো প্রভাবক বা উপাদানের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে একটি প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করতে সহায়তা করে। সকল ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কতিপয় উপাদান দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত হয়। এ প্রভাবকগুলো হলো জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত পরিবেশ।

- **জনসংখ্যা :** একটি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব, প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি যে এলাকায় ব্যবসায়টি অবস্থিত সে এলাকার জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য বা সেবা সামগ্রির বাজারের আকার বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও জন্ম-মৃত্যু দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- **অর্থনৈতিক পরিবেশ :** পণ্য বা সেবার চাহিদা ব্যবসায়টির চারিদিকে বসবাসকারি ভোক্তাদের আয়, সঞ্চয়, খরচ করার প্রবণতা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত। প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব যথাযথভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
- **প্রাকৃতিক পরিবেশ :** সঠিক ব্যবসায় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাট ভূমিকা পালন করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আসে। তবে যেসব শিল্প কারখানা পরিবেশকে দূষণ করে সে সব ব্যবসায় পরিত্যাজ্য।
- **রাজনৈতিক পরিবেশ :** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের দর্শন ও রাজনীতিবিদদের আচরণ ব্যবসায় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।
- **সাংস্কৃতিক পরিবেশ :** শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।
- **আইনগত পরিবেশ :** দেশের প্রচলিত আইন, ব্যবসায় ও শিল্পনীতি ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

ম্যাক্রোস্কিনিং-এর মাধ্যমে প্রকল্প নির্বাচন একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। চূড়ান্তভাবে প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্পটির যথার্থতা আরো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মাইক্রোস্কিনিং-এর সাহায্য নেয়া প্রয়োজন হয়।

খ. মাইক্রোস্কিনিং

মাইক্রোস্কিনিং হলো বাজার চাহিদা, কারিগরি, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার বিস্তারিত প্রক্রিয়া। নিচে মাইক্রোস্কিনিং-এর উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

- **বাজার চাহিদা :** বাজার জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে পণ্যের চাহিদা, ক্রেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহ, বাজারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা এবং পণ্য বা সেবার সুযোগ-সুবিধা যথার্থভাবে যাচাই করা হয়।
- **কারিগরি দিক :** প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা হয় প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সহজসাধ্যতা ইত্যাদি।
- **বাণিজ্যিক দিক :** প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনকতা নির্ধারণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের উপাদান, বিক্রয় মূল্য, আনুমানিক লাভ ইত্যাদি বিষয়সমূহ খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়।

- **আর্থিক দিক :** এক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ, অর্থায়নের উপায়, মূলধন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য লাভ ইত্যাদি হিসেব করে প্রকল্প যাচাই-বাছাই করতে হয়।

- **জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান :**

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি কীভাবে অবদান রাখবে তাও পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। অর্থনীতিতে অবদান যাচাই করার মাপকাঠি হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ, জাতীয় কোষাগারে কর প্রদানের পরিমাণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক তাই বিনিয়োগের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র সেবামূলক ব্যবসায়, কেনা-বেচা ও অন্যান্য খুচরা ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান বিবেচনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসায়, যেমন ম্যানোফ্যাকচারিং ব্যবসায়ের প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ম্যাক্রো ও মাইক্রো উভয় প্রকার কিনিং আবশ্যিক।

৩. ব্যবসায় প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন

ব্যবসায় প্রকল্প প্রণয়নের শেষ ধাপ হলো একটি সুন্দর প্রতিবেদন তৈরি করা। নির্বাচিত প্রকল্পটির সম্ভাবনা যাচাইয়ের তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়।

ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো ব্যবসায়ের ভবিষ্যত কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। এটি একটি লিখিত দলিল যার মধ্যে ব্যবসায়ের লক্ষ্য, প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনার ধারা, অর্থায়নের উপায়, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত উন্নয়নের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়। কোন ব্যবসায় কোন দিকে অগ্রসর হবে ও কীভাবে ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন করা যাবে তার সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ব্যবসায় পরিকল্পনায় পাওয়া যায়। জাহাজ বা উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে রাডার যেমন চালককে পথ চলার নির্দেশনা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে, তেমনি ব্যবসায় পরিকল্পনা কোনো ব্যবসায়ীকে তার কাজক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। নতুন ব্যবসায় শুরু করা অথবা বর্তমান ব্যবসায় সম্প্রসারণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায় পরিকল্পনাকে ভ্রমণকারীর জন্য রোড ম্যাপ এবং একজন দালান নিমাতার নীল-নকশার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

কেস স্টাডি

জনাব শাহিনা একজন গৃহিণী। তাঁর দুটি সন্তান কলেজে পড়ে। বাড়িতে দৈনন্দিন কাজের পরও অনেকটা সময় সে অবসর পায়। স্বামী একটা হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত। মিসেস শাহিনা কলেজে পড়ার সময় বিউটি পার্লারের কাজ শেখেন। এ বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছেন। সন্তান সন্ততি লালন পালন ও দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের চাপে তিনি একটা পার্লার খুলতে পারেননি। একদিন তাঁর স্বামীর কাছে পার্লার খোলার ইচ্ছে পোষণ করলে তার স্বামী তাঁকে উৎসাহিত করেন। ড্রয়িং রুমের পাশে একটি ঘরে মিসেস শাহিনা একটা পার্লার স্থাপন করলেন। সিটি কর্পোরেশন থেকে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করলেন। পার্লারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য মিসেস শাহিনা ব্যাংক থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে পার্লার বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মিসেস শাহিনা একা হাতে সব কিছু সামলাতে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষিত দুজন মেয়েকে তাঁর পার্লারে নিয়োগ দিলেন। প্রচারের জন্য স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে বিজ্ঞাপন দিলেন। একজন কর্মী তার একজন সেবা গ্রহিতার সাথে ব্যবহার খারাপ করায় মিসেস শাহিনা ঐ কর্মীকে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। নতুন আর একজনকে নিয়োগ দিলেন। এভাবেই মিসেস শাহিনা তাঁর ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় সফলতা অর্জন করলেন। দুই বছরের মধ্যে ব্যাংক থেকে গৃহিত লোন পরিশোধ করলেন।

৭.৪ ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায়কে মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের সেতুবন্ধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যবসায়ের প্রসারের ফলে সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে নগরায়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি। মানবজীবনে ব্যবস্থাপনা একটি অপরিহার্য বিষয়। পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসায় সবক্ষেত্রে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার উদ্ভব হয়েছে। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের কাজ করিয়ে নেয়ার কৌশল হলো ব্যবস্থাপনা। আলোচ্য পাঠে ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনার ধারণা ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করব।



ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সভা অনুষ্ঠানের ছবি

ব্যবস্থাপনার ধারণা

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে ব্যবস্থাপনার উৎপত্তির সহ-সম্পর্ক রয়েছে। শুরুতে ব্যবস্থাপনা ছিল পরিবার ও দলভিত্তিক। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবস্থাপনার ধারণাটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ব্যবসায়ী সমাজের ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতি থেকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেয়ার কৌশলকে ব্যবস্থাপনা বলে। একটি গল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার ধারণাটি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

জনাব হাসান একজন মুদি দোকানদার। ব্যবসায়িক সততার কারণে খুব দ্রুত তার খরিদদার বেড়ে গেল। ব্যবসায় ভালো লাভ করতে থাকে। এক সময় তিনি অটোরাইস মিল স্থাপনের চিন্তা করলেন। এ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে তিনি কথা বলে অভিজ্ঞতা নিলেন। বছর পাঁচ হলো তিনি একটি রাইসমিল স্থাপন করেছেন। শুরুতেই ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ প্রদান করেন। নিজেই মিলের যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করতেন। একদিকে মুদি দোকানের কাজ অন্যদিকে রাইসমিলের কাজ ইত্যাদি তারপক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেখাশুনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তিনি একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিলেন। এতেকরে তার প্রতিষ্ঠানের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। মিলের শ্রমিকদের চাতালের পাশেই আবাসনের ব্যবস্থা করায় মিলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বেড়ে ওঠে। চাল বাজারজাতকরণের জন্য দুটি ট্রাক কিনে বিভিন্ন আড়তে চাল সরবরাহ করতে থাকেন। বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে একজন বিপণনকর্মী নিয়োগ দেন। এতেকরে জনাব হাসানের ব্যবসায়িক প্রসার ঘটতে থাকে এবং সফলতা লাভ করেন। ব্যবস্থাপনা হল দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীদের কার্য সম্পাদনের একটি প্রক্রিয়া। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের মানবিক ও অন্যান্য উপাদানকে সুচারুরূপে পরিচালনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপনার ইংরেজি প্রতিশব্দ Management. ইংরেজি Management শব্দটি ইতালীয় menaggiare শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো to train up the horses অর্থাৎ অশ্বকে প্রশিক্ষিত করে তোলা বা চালনা করা। যা কালের বিবর্তনে মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তার নিকট থেকে কাজ আদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সহজ অর্থে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এতে নিয়োজিত লোকদের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার দক্ষতা ও কৌশলই হলো ব্যবস্থাপনা।

ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অন্য লোকদের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার দক্ষতা ও কৌশল। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলে পরিচিত হেনরি ফেওয়েল (Henri Fayol) এর মতে ‘ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি’। ব্যবস্থাপনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

- ব্যবস্থাপনা হলো কতকগুলো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া;
- ব্যবস্থাপনা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়;
- ব্যবস্থাপনা একটি দলগত প্রক্রিয়া;
- ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া;
- সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সাথে মিল রেখে ব্যবস্থাপনার কাজের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হয়।

৭.৫ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে এতে নিয়োজিত উপকরণাদির যথাযথ ব্যবহার কার্যকর ব্যবস্থাপকীয় কাজের উপর নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপনাবিশারদগণ ব্যবস্থাপনার এ কাজকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে ছকের সাহায্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কার্য শ্রেণিবিন্যাস তুলে ধরা হলো :

বিশেষজ্ঞের নাম	ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি
Koontz & Donnell	পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন
H. Fayol	পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ
L. Gullick	পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, রিপোর্ট প্রদান ও বাজেট প্রণয়ন। সংক্ষেপে- ‘POSDCORB’ P- Planning, O- Organizing, S- Staffing, D-Directing, C-Co-ordinating, R- Reporting, B- Budgeting.
Earnest Dale	পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ, উদ্ভাবন ও উপস্থাপন

উপরের ছকে বর্ণিত ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

• পরিকল্পনা (Planning)

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কাজ। কোনো ব্যবসায় সংগঠনের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী করতে হবে, কখন,কিভাবে ও কত সময়ে করতে হবে ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণই হলো পরিকল্পনা।

• সংগঠন (Organizing)

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংগৃহীত উপাদান ও মানবশক্তির সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে সংগঠন বলে। সংগঠন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় কার্যাদি সনাক্তকরণ ও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বণ্টন করা হয় এবং কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যাতে তারা সর্বাধিক তৎপরতায় কার্য সম্পাদন করতে পারে।

কর্মী সংস্থান (Staffing)

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উপাদান হচ্ছে তার কর্মীবাহিনী। সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণের পর ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা। অর্থাৎ কার্য সম্পাদনের জন্য কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পদোন্নতি, বদলী, ছাটাই প্রভৃতি কাজ কর্মী সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

• নির্দেশনা (Directing)

কর্মী সংস্থানের পর ব্যবস্থাপনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীদের নির্দেশ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করা। কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান, তত্ত্বাবধান, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান এবং অনুসরণ কার্যকে নির্দেশনা বলে। কোন কাজ কখন, কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থাপক কর্মীদের বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

- **প্রেষণা (Motivation)**

প্রেষণা হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া। কাজের জন্য কর্মীদের শুধুমাত্র আদেশ দিলেই চলে না। ব্যবস্থাপনাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ সৃষ্টি ও তা ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে হয়। প্রেষণার ফলে কর্মীরা আত্মহ নিয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয় ও মানসম্মত কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়।

- **সমন্বয় সাধন (Co-ordination)**

ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের কার্যাবলিকে একসূত্রে গ্রথিত, সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ করার প্রক্রিয়া হলো সমন্বয় সাধন। সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সবাই মিলে একটি দলে পরিণত হয় যা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।

- **নিয়ন্ত্রণ (Controlling)**

পরিকল্পনার আলোকে প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ, কারণ নির্ণয় ও তা বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে। মূলত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সঠিক কাজ সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক সময়ে সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা হয়। নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায় সংগঠন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

৭.৬ নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ

মাঝি ছাড়া যেমন নৌকা চলে না, তেমনি নেতৃত্ব ছাড়া দেশ জাতি ও সমাজ চলতে পারেনা। নেতৃত্বের কাজ হলো তার অনুসারীদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিচালনা করা। তাই যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান তার কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা।



অধস্তন জনশক্তিকে নেতৃত্ব দানের একটা কার্টুন চিত্র

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচালনা করা, নির্দেশ প্রদান করা, পথ প্রদর্শন করা ইত্যাদি। অর্থাৎ নেতৃত্ব হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সংঘবদ্ধ কর্মীদের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। নেতৃত্ব একটি শক্তিশালী কৌশল যার দ্বারা অনুসারীদের দলীয় কর্মে কাক্ষিত ভূমিকা পালনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়। নেতৃত্বের ধারণা বহুমুখী ও ব্যাপক। বিভিন্ন লেখক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে অধিকাংশই একমত যে নেতৃত্ব হলো কোনো অবস্থা বিশেষে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত বা দলীয় কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করার একটি কার্যকরী প্রক্রিয়া। বস্তুত নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা (Leader), অনুসারী (Follower) ও পরিস্থিতিগত (situational) চলকসমূহের আন্তঃসম্পর্কীয় কার্যকলাপ (Function)। Wershey and Blanchard নেতৃত্বের এ তিনটি চলকের সম্পর্কে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ সমীকরণকে নেতৃত্বের সমীকরণ বা Equation বলে।

নেতৃত্বের সমীকরণটি নিম্নরূপ-

$$L = f(l, f, s)$$

L= Leadership

F= function

l= Leader

f= follower

s=situation

অতএব সমীকরণটির অর্থ দাঁড়ায় নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা, অনুসারী এবং অবস্থাভেদে নেতার কাজ।

নেতৃত্বের প্রকারভেদ

দলকে পরিচালনা করার জন্য বা কাজে প্রভাবিত করে কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সংগঠনের পরিস্থিতি ও অনুসারীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে নেতৃত্বের ভিন্নতা বা প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। এগুলো নিচে দেয়া হলো।

- **গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব (Democratic Leadership)**

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ যে ধরনের নেতৃত্বে নেতা তার সমগ্র ক্ষমতা নিজের কাছে কেন্দ্রীভূত না রেখে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অধস্তনদের কাছে হস্তান্তর করে তাকে অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব বলে। যে কোনো বিষয়ে নেতা তার অধস্তন কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে কর্মীরা নেতার প্রতি আস্থাশীল হয় এবং নেতা কর্মীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ প্রকাশ করে। এরূপ নেতৃত্বের অধীনে কর্মীদের মনোবল, নৈতিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এখানে দলের প্রত্যেক সদস্য নিজেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

- **স্বৈরতান্ত্রিক বা প্রভুত্বমূলক নেতৃত্ব (Autocratic Leadership)**

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব নেতার একক কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে নেতা সকল ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে এবং দলের অন্যান্য সদস্যদের মতামত তোয়াক্কা না করে নিজে ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ নেতৃত্বে নেতা মূলত স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে এবং নিজের পছন্দমতো কাজ পরিচালনা করে। কর্মী বা দলের সদস্যরা উপেক্ষিত থাকে এবং নেতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে কাজ আদায় করতে যেয়ে নেতা শাস্তির ব্যবস্থা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে থাকে।

- **আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Bureaucratic Leadership)**

এরূপ নেতৃত্ব সংগঠনের লিখিত নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। সংগঠন পরিচালনায় নেতা দলীয় কর্মীদের ইচ্ছা ও মনোভাবের বিষয়টি বিবেচনার পরিবর্তে আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও কর্মপদ্ধতির উপর অত্যধিক জোর দেন ও তার কর্তৃত্বের প্রতিনিধি রূপে কাজ করেন। আমলাতান্ত্রিক কৌশল কর্মীদের প্রেরণা যোগায় এবং সহকর্মী ও কাজের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

- **অবাধ বা মুক্ত নেতৃত্ব (Laissez faire/Free Rein Leadership)**

এ ধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা কোনো নেতৃত্বমূলক কাজে বিশেষভাবে জড়িত না থেকে কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। অনুসারীদের সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ফলে নেতার অনুসারিগণ যে কোনো নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। অবাধনেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অনেকটা মাঝিবিহীন নৌকার সমতুল্য। মাঝিবিহীন নৌকা যেমন বাতাসের গতিতে চলতে থাকে, নদীতে ঝড় উঠলে নৌকা ঘুরপাক খেয়ে ডুবে যায় আর বাতাস অনুকূলে থাকলে অবাধ গতিতে চলতে থাকে এবং কদাচিৎ লক্ষ্য অর্জনে খুব কমই সফল হয়। এরূপ নেতৃত্বের কার্যত কোনো সুবিধা নেই। প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সময়ই বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং অনুসারীরা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন প্রকার নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক	নেতৃত্বের ধরন	বৈশিষ্ট্য
১.	গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব	- নেতা অধস্তনদের সাথে আলোচনা করেন। - অধস্তনদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। - কর্মীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। - কর্মীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। - কর্মীরা প্রশ্ন করলে তার জবাব দেন। - কর্মীদের জবাবদিহিতা আশা করেন। - কর্মীদের নিকট জবাবদিহি করেন। - কর্মীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন।
২.	স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব	- নেতা শুধু আদেশ করেন, জবাবদিহি করেন না। - সম্পূর্ণভাবে নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেন। - কর্মীদের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখেন না। - কর্মীদের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণ করেন না। - কর্মীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। - কর্মীদের সবসময় চাপের মুখে রাখেন। - কর্মীরা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ভাবতে পারেন না।
৩.	মুক্ত নেতৃত্ব	- নেতা কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকেন। - নিজে কাজ করতে পছন্দ করেন না এবং আগ্রহী নন। - কর্মীদের উপর সুনির্দিষ্ট আদেশ দেন না। - কর্মীদের জবাবদিহিতা আদায় করেন না। - কর্মীরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে থাকে। - সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় বেশি লাগে। - প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ভালো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও দলীয় কাজের উপর।
৪.	আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব	- নেতা কর্মীদের আদেশ দিয়ে কাজ আদায় করে নেন। - কর্মীরা নেতার চেয়ে আদেশকে বড় করে দেখেন এবং পালন করতে বাধ্য থাকেন। - সর্বদা নিয়মমাফিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। - নেতার চেয়ে নেতার আদেশ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে শৃঙ্খলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৭ নেতৃত্বের গুণাবলি

জনাব রহমান একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে নতুন চাকুরি নিয়ে যোগদান করলেন। যোগদানের দিন তিনি দেখলেন তার টেবিলে অসংখ্য ফাইল স্তুপ করে রাখা আছে। চেয়ার টেবিলে ময়লা। কিছুদিনের মধ্যে দেখলেন অফিসে কারো আগমন প্রস্থান ঠিক না। বিগত কয়েকমাস যাবৎ হাজিরা খাতায় কোন স্বাক্ষর নেই। কার্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব সময়মতো লিপিবদ্ধ করা হয়না। নারী সহকর্মীদের জন্য কার্যালয়ে পৃথক কোনো টয়লেট নেই। সেবা গ্রহীতাদের সাথে অফিসের স্টাফগণ দুর্ব্যবহার করে করেন। অফিসের একজন সহকর্মী দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল রোগে ভুগছেন। অর্থের অভাবে ভাল চিকিৎসা করতে পারেন না। অফিসে কোনো নৈশপ্রহরী না থাকায় চিঠিপত্র সময়মতো বিতরণ হয় না। জনাব রহমান এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কার্যালয়ের কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সহকর্মীদের সাথে সভা করেন। সহকর্মীদের মাঝে সুনির্দিষ্ট কর্মবন্টন করেন। উপজেলা পরিষদের সহায়তায় নারী সহকর্মীদের জন্য একটা পৃথক টয়লেট নির্মাণ করেন। অসচ্ছল সহকর্মীকে সবাই মিলে আর্থিক সাহায্য করেন। ভালো চিকিৎসার ফলে তিনি বেশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। দাপ্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একজন নৈশপ্রহরীকে নিয়োগ করেন। এতো ভালো কাজের পরও একজন কার্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন না। উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করেন এবং অন্যত্র বদলি করেন। এতে করে জনাব রহমান তার কার্যালয়ের কাজে গতিশীলতা আনেন। তার নেতৃত্বের দক্ষতায় সেবার মান বৃদ্ধি পায়। জনাব রহমান একজন প্রশাসনিক নেতা হলেও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা নির্ভর করে একজন আদর্শ নেতার সুদক্ষ নেতৃত্বের উপর। দক্ষ নেতৃত্ব দানের জন্য একজন নেতার বিশেষ গুণাবলি থাকা অপরিহার্য। নিম্নে একজন আদর্শ নেতার গুণাবলি উল্লেখ করা হলো:-

- **শারীরিক সুস্থতা :** একজন নেতাকে অবশ্যই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কেননা নেতৃত্ব দানের জন্য তাকে সার্বক্ষণিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং চাপ বহন করতে হয়। এজন্য তাকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে।
- **মোহনীয় ব্যক্তিত্ব :** মোহনীয় ব্যক্তিত্বের গুণে সংগঠনের কর্মীরা নেতার আদেশ নির্দেশ আন্তরিকভাবে মেনে চলে। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই সকলেই নেতাকে সম্মান করে।
- **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা :** কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল অর্জন করাকে শিক্ষা বলে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একজন মানুষ যা শেখে তাও শিক্ষা হিসাবে গণ্য। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে ইতিবাচক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করে। তাই একজন নেতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- **সাহসী:** একজন নেতাকে সবসময় বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। তাই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য একজন নেতার অসীম সাহস থাকা আবশ্যিক।
- **সহযোগিতামূলক মনোভাব :** একজন নেতাকে সহকর্মীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকলের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে হবে।
- **ধৈর্য :** ধৈর্য নেতার একটি অপরিহার্য গুণ। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেতা ধৈর্যের পরিচয় দিতে না পারলে তার পক্ষে অনুসারীদের সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। কেননা অধস্তনরা সব সময় কাক্ষিত আচরণ করে না। সেক্ষেত্রে তা সংশোধনের জন্য নেতাকে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হয়।
- **সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতা :** সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে তা পরিচালনার জ্ঞান ও দক্ষতাকেই সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতা বলে। কাজ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মী বাছাই, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সমন্বয় সাধন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের যথাযথ বন্টনে নেতাকে সাংগঠনিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়।
- **সৃজনশীলতা :** একজন নেতাকে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য নেতা তার প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার সংমিশ্রণে নব নব দিগন্ত উন্মোচন করবেন।
- **ন্যায়পরায়ণতা :** একজন আদর্শ নেতার অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যিক। সকল অবস্থায় অন্যায় পরিহার করে তিনি সবার জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।
- **যোগাযোগ দক্ষতা :** নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতা সুন্দরভাবে তার চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি আদেশ নির্দেশ অনুসারীদের নিকট তুলে ধরলে কাজ বাস্তবায়ন সহজ হয়। তদ্রূপ অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া নেতার কাছে থাকার প্রয়োজন হয়। যা যোগাযোগ সম্পর্কিত দক্ষতার মাধ্যমেই নেতা অর্জন করতে পারে।
- **সিদ্ধান্তগ্রহণে পারদর্শী :** কোনো প্রতিষ্ঠানের কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। একজন নেতাকে অবশ্যই তার প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হতে হবে।

- **উৎসাহ দানের দক্ষতা :** উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের প্রতি উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনো কর্মীকে কোন অবস্থায় কীভাবে কাজে উদ্বীগুত করা যায় এ সম্পর্কে নেতার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
- **মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন :** সহকর্মীদের মনোভাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দিতে না পারলে কার্যকর ও সুদূর প্রসারী ফলাফল আশা করা যায় না। তাই একজন নেতাকে অবশ্যই তার অনুসারীদের আশা আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, যোগ্যতা ইত্যাদি অনুধাবন করার ক্ষমতা থাকা উচিত।
- **জেন্ডার সচেতনতা :** একজন নেতাকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হবে। তাকে অবশ্যই তার সকল সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সম মনোভাবাপন্ন হতে হবে। নারী পুরুষের বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে তাকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে নেতা বলা হয়। নেতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহিত ও পরিচালনা করা। নেতৃত্বদানের কঠিন দায়িত্বশীল কাজটি সম্পাদনের জন্য একজন নেতার অনেকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। কেননা উপযুক্ত নেতৃত্ব যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে, তেমনি নেতার অযোগ্যতা প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

৭.৮ ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু সেরা জীব হিসেবেও মানুষ নীতি গঠিত ও মূল্যবোধ বিবর্তিত বিভিন্ন অন্যায্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে। যেমন আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে প্রতি বছর রমজান মাসে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও ব্যবসায়ী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা মেনে চলতে হয়। ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



পরিবেশ দূষণ

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা

যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজে মূল্যবান ও অনুকরণীয় বলে বিবেচিত হয় তাই মূল্যবোধ। নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায্য-অন্যায্য, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক, মঙ্গলময় ও কল্যাণময় দিকের নির্দেশনা দেয়। অন্যায্য থেকে ন্যায্য, অধর্ম থেকে ধর্ম, অসত্য থেকে সত্য, অনুচিত থেকে উচিত পৃথকীকরণ বা নিরুপণের ক্ষমতা নৈতিক নীতিবোধ থেকে আসে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গঠন এবং দেশের জনগণের জন্য নৈতিক আচরনবিধি অনুসরণ একান্ত আবশ্যিক।

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হলো মানুষের মানবীয় গুণাবলি যা সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, শিক্ষা, ধর্মীয় নিয়মনীতি প্রভৃতি থেকে যে বোধের সৃষ্টি হয় তাই মূল্যবোধ। এটিকে মানুষের জীবন দর্শন বলেও অভিহিত করা হয়। আর ব্যবসায়ী যখন যে নিয়মনীতি ও আদর্শ মেনে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে তখন তাকে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলে। বিভিন্ন ধর্মে বৈধভাবে ব্যবসায় পরিচালনার কথা উল্লেখ রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতি মেনে চলে এবং এ নিয়মনীতি বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে ব্যবসায়িক মূল্যবোধের জন্ম যা সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে।

ব্যবসায়ের নৈতিকতা

নৈতিকতা শব্দটি গ্রিক শব্দ ইথস শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো রীতিনীতি বা আচরণগত অভ্যাস। এটিকে মানব আচরণের মানদণ্ড বলা হয়। নৈতিকতার বিষয়টি মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের অর্থাৎ ভালোমন্দের উচিত-অনুচিত ইত্যাদির সাথে জড়িত। সেহেতু ব্যবসায়ের কি ধরনের আচরণ করা উচিত ও কী করা উচিত নয় সেটি যে মানদণ্ডের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাকে ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলে। ব্যবসায় সুষ্ঠু ও সফলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। নৈতিকতা এক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। ফলে আমাদের আচরণকে ব্যবসায় জগতে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

ব্যবসায়ের নৈতিকতাগুলো নিম্নরূপ-

- সততা বজায় রাখা;
- ক্ষতিকর ও নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন না করা;
- পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা;
- ওজনে কম না দেয়া;
- প্রতারণা হতে বিরত থাকা;
- পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা;
- মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য দ্রব্য বিক্রি না করা;
- ব্যবসায়িক আইন মেনে চলা।

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের ভালো-মন্দ বিচার করা যায়। ব্যবসায়ের লক্ষ্য শুধু মুনাফা অর্জন নয় বরং বর্তমানে ব্যবসায় সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে বর্তমানে ব্যবসায় অনৈতিক কার্যকলাপের চিত্র ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়, ফরমালিন ও বিভিন্ন কেমিকেলযুক্ত মাছ, ফলমূল বিক্রয়, বিজ্ঞাপনে পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান ও ঔষধে ভেজাল ইত্যাদি অনৈতিক কার্যকলাপের ফলে সমাজে শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকে তাহলে আমরা ভবিষ্যতে একটা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব। ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- **বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা :** ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাহত করা যায় তাহলে বিভিন্ন ব্যবসায়িক আইন মেনে মানুষের কল্যাণের জন্য বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
- **সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গঠন :** বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ঔষধপত্রে ভেজালের কারণে অনেক শিশু মৃত্যু বরণ করেছে। ব্যবসায়ের নৈতিকতা বোধ এসব ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করে একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- **ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা :** ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়ে সামাজিক পক্ষগুলো জড়িত থাকে। ব্যবসায়ে মূলধন, বিনিয়োগ, ঋণ, মুনাফা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সন্নিবেশ ঘটলে উৎপাদক, বিক্রেতা, ক্রেতা সকলেই সমাজের অংশ হিসেবে এর সুফল ও তাদের ন্যায্য অধিকার পায়।
- **সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি :** অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হয় এবং এতে কেউ লাভবান হয় না। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে উৎপাদনকারী শ্রমিক ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির প্রতি ব্যবসায়ীরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ট থাকে তাহলে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা সম্ভব।

- **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** ব্যবসায়ের সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিকতার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবসায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়।
- **ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য ও সেবা প্রাপ্তি :** ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। আর ভোক্তাদের উপর ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জন নির্ভর করে। ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ফলে ভোক্তাদের ন্যায্য দামে ভালো মানের পণ্য ও উপযুক্ত সেবা প্রদান সম্ভব হয়।
- **প্রতারণা ও জালিয়াতি না করা :** নিম্ন মানের পণ্য তৈরি, ওজনে কম দেয়া, চটকদার বিজ্ঞাপন দেয়া, কর প্রদান না করা বিভিন্ন উপায়ে মিথ্যাচার ও প্রতারণা করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকলে ব্যবসায়ী এ ধরনের প্রতারণা ও জালিয়াতি করতে পারে না।
- **মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় :** নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থাকলে মালিকপক্ষ কখনও শ্রমিকদের ঠকায় না। তাদের ন্যায্য মজুরী প্রদান, উপযুক্ত বেতন-বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা করে উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।
- **অনৈতিক কৃষ্টির বিকাশ রোধ :** কাঁচামালের সঠিক মূল্য না দেয়া পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কর্মীদের সঠিক সময়ে ন্যায্য মজুরী না দেয়া, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঋণ খেলাপী হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে অনৈতিক কৃষ্টির বিকাশ ঘটেছে শুধুমাত্র মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ফলে তা দূর করা সম্ভব।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা (Concept of Social Responsibilities)

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব পালন করাকে বুঝায়। ব্যবসায় সমাজ বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সমাজকে ঘিরেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাছে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করাই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গ্রাহক বা ক্রেতার বাইরেও বিভিন্ন পক্ষসমূহ যেমন বিনিয়োগকারী, শ্রমিক-কর্মী, সরবরাহকারী, প্রতিবেশী ব্যবসায়ী, সরকার এবং সমাজের জনগণ বিভিন্ন পক্ষের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এদের প্রতি ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এগুলোকে সামাজিক দায়িত্ব পালন হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সমাজের একজন সচেতন মানুষ হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব। আর এটা সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি অংশ। পরিশেষে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের সাথে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী, সাধারণ জনগণ ও সরকারের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব

ব্যবসায় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য গঠিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে ভালো করার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে অবশ্যই সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবসায় চালাতে হয়। নিম্নে ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

- **ভোক্তা সচেতনতা সৃষ্টি**
ক্রেতা ও ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে না পারলে ব্যবসায়ী ভালোভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে না। কেননা এখন ক্রেতা ও ভোক্তারা অনেক বেশি সচেতন। তাই সমাজের এই মানুষগুলোকে ব্যবসায়ীদের সব সময় খেয়াল রাখতে হয়।
- **কর্মী সচেতনতা সৃষ্টি**
প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ হলো (শ্রমিক-কর্মচারী) কর্মী। তাদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে তারা অনেক বেশি সচেতন। প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যবসায়ীকে অবশ্য কর্মীদের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে হয়।
- **সামাজিক বিপর্যয় রোধ**
ক্রেতা ও ভোক্তা হলো ব্যবসায়ী সৌভাগ্যের ধন। তাদের ঠকিয়ে নকল পণ্য তৈরি করে, প্রতারণা করে, ওজনে কম দিয়ে, চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, ভেজালমিশ্রিত ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন করলে সমাজের যে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তা থেকে ব্যবসায়ীরাও রক্ষা পাবে না। তাই এ ধরনের সামাজিক বিপর্যয় রোধে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

- **প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সামর্থ্য বৃদ্ধি**
সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করার ফলে ব্যবসায়ীরা সমাজের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে পণ্যের বাজার বিস্তৃত করতে পারে। ফলে বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়।
- **সহযোগিতার উন্নয়ন**
যেহেতু ব্যবসায় একটি সমাজ সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান তাই সবার সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এর বিকাশ লাভ করে। ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও ক্রেতা, শ্রমিক, কর্মচারী, বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী পণ্য সরবরাহকারী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকার বিভিন্ন পক্ষসমূহের সহযোগিতায় ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতাই এ ধরনের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা

বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে ভালো কিছু করতে হলে ব্যবসায়ীদের অবশ্য সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা

ক্রেতা বা ভোক্তারা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই ব্যবসায়ীকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়:

- পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা ও ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা;
- চাহিদানুযায়ী পণ্য সামগ্রী সহজ শর্তে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- পণ্য ও বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা;
- নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে ক্রেতাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধিকর ইত্যাদি।

২. শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা

শ্রমিক কর্মচারী ব্যবসায়ের মূল শক্তি। তাদের পরিশ্রমের উপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। তাই ব্যবসায়ীকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

- ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান;
- শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে ভালো আচরণ করা;
- সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- চাকরির নিরাপত্তা বিধান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা;
- বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩. বিনিয়োগকারী ও সরবরাহকারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা

বিনিয়োগকারীরা মূলত আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশায় অর্থ বিনিয়োগ করে। কাঁচামাল সরবরাহকারী ও ঋণদাতারা তারাও যথাসময়ে তাদের পাওনা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে। সুতরাং তাদের প্রতিও ব্যবসায়ের কিছু দায়িত্ব থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ:

- বিনিয়োগজিত অর্থের নিরাপত্তা বিধান ও সদ্যবহার করা;
- পাওনাদারদের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা;
- শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায্য লভ্যাংশ দেয়া।

৪. সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতা

দেশের ব্যবসায় উন্নয়নে সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে। তেমনি সরকারের প্রতি ব্যবসায়েরও দায়িত্ব পালন করতে হয়।

- সরকারি আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করা;
- সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা;
- জাতীয় সম্পদের সদ্যবহার করা;
- সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা দেয়া;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

৫. সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের বহুমুখি দায়িত্ব আছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব নিম্নে দেয়া হলো-

- জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করা;
- সমাজের জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সহায়তা করা;
- দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;
- জাতীয় দূর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানো;
- পরিবেশ দূষণ রোধ করা;
- সমাজের সার্বিক লক্ষ বাস্তবায়নের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা।

বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম

বর্তমান দেশে-বিদেশে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া ছাড়াও অনেক সামাজিক কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। ব্যবসায়ীরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সমাজকে সেবা দিচ্ছে। বড়-বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, অবহেলিত মানুষকে সহায়তা দান, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল কোম্পানি তাদের সাধারণ ব্যবসায় কার্যক্রমের পাশাপাশি অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি যেমন গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক, রবি, সিটিসেল, এয়ারটেল, টেলিটক প্রভৃতি শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার খরচ বহন, বৃত্তি প্রদান, চিকিৎসা সেবা প্রদান, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও খেলাধুলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ সুরক্ষা, ভোটার আইডি কার্ড তৈরি, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, টাকা দান কর্মসূচিতে সহায়তা দান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সেবা প্রভৃতি সমাজসেবামূলক এবং তরুণ সমাজের প্রতিভা অনুসন্ধান বিকাশে এগিয়ে এসেছে। এভাবে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সাথে ভবিষ্যত আরো সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ক. ব্যবসায় পরিকল্পনা কী?
- খ. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলতে কী বুঝায়?
- গ. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা কী?
- ঘ. নেতৃত্ব কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

২. ক. ব্যবসায়ের আইনগত দিক বলতে কী বোঝায়?
খ. ব্যবসায়ের বিশেষ বিশেষ আইনগত দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। ক. ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?
খ. ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
- ৪। ক. নেতৃত্বের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
খ. একজন নেতার কী কী গুণাবলি থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন? লিখুন।
- ৫। ক. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বুঝায়?
খ. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতাগুলো বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৮ : ব্যবসায় উদ্যোগ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মূল্যায়নের ভূমিকা

আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের সম্পাদিত কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মান যাচাই করে থাকি। কারণ সবশেষে আমরা আমাদের কাজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই। এজন্য আমরা কাজ চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে কাজটি নির্দিষ্ট সময় ও মানে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখি। আবার কাজটি পরিকল্পনামাফিক ও কাজের মানের হেতু কিনা তা জানার জন্য কাজের শেষেও আমরা মূল্যায়ন করে থাকি। অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের মান যাচাই করাই হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সবসময় মূল্যায়ন করে থাকেন। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এটির ব্যতিক্রম নয়। ব্যবসায় উদ্যোগ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মূল্যায়নের ভূমিকা অধ্যায়ে মূল্যায়নের ভূমিকা, স্বজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি ও ব্রুমের শিখনক্ষেত্র, স্বজনশীল প্রশ্নের গুরুত্ব ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ মূল্যায়নের ভূমিকা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

৮.২ স্বজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ও ব্রুমস্ এর শিখন ক্ষেত্রসমূহ

৮.৩ স্বজনশীল প্রশ্নপত্রের গুরুত্ব

৮.৪ শ্রেণি অভীক্ষা ও অগ্রগতি যাচাই অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

৮.৫-৮.৬ বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা, নিরীক্ষণ ও পরিশোধন

৮.১ : মূল্যায়নের ভূমিকা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হলো শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করার প্রক্রিয়া। অন্যান্য বিষয়ের মতো ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়, আর এ যাচাই করার প্রক্রিয়াটাই মূল্যায়ন। মূল্যায়ন একটি চলমান বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছে অথবা উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর ‘শিখন অগ্রগতি যাচাই’ পরিমাপ ও মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দু’ভাবে এ মূল্যায়ন করা হয়। একটি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে, অন্যটি একটি সুনির্দিষ্ট সময় বা কার্যক্রম শেষে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অর্জন মূল্যায়ন করে। একটিকে ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন ও অন্যটিকে সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলা হয়। শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও সামষ্টিক দু ধারার মূল্যায়নেরই প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা জানি শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয়ই মূল্যায়ন বা শিখন অর্জন যাচাই। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও শিখনফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করাই হলো মূল্যায়ন। যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, তাই মূল্যায়ন বলতে শুধু শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা বিষয়বস্তু কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করাকেই বুঝায় না। বরং এটি শিক্ষার্থীর দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মূল্যায়নকেও অন্তর্ভুক্ত করে। মূল্যায়নের সময়কাল অর্থাৎ শিখনের কোন পর্যায়ে মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা হয়। এসব মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে মূলত দুটি ধারার ভাগ করা হয়েছে। একটি গঠনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Formative Assessment), অন্যটি সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)।

শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন অথবা একটি পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীর অর্জন ও অগ্রগতি যাচাই হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন। আবার নির্দিষ্ট সময়ের শেষে বা কোনো একটি সাময়িক বা কোর্সের মেয়াদ সমাপ্তিতে যে মূল্যায়ন তা হলো সামষ্টিক মূল্যায়ন।

শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মনোপেশিজ ও আবেগিক ক্ষেত্রের মূল্যায়নও এর মাধ্যমে করা যায় এবং শিক্ষার্থীর কাজের শিখনলাভ উভয় বিষয়ের জন্যই এই মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তার শিখন-

শেখানো কার্যক্রম কতটুকু সফল হচ্ছে তা জানতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখনকে বেশি কার্যকরী ও সুনির্দিষ্ট করে ফলপ্রসূ করা। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়নকে শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning) বলা হয়। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শুধু পাশ-ফেল বা ফলাফল নির্ধারণ করা হয় না, একই সাথে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে শিখন সহায়তা প্রদান করা হয়।

কাজ:

ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন		
পার্থক্যের বিষয়	ধারাবাহিক মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন
১. সময়কাল		
২. ক্ষেত্র		
৩. ব্যাপ্তি		
৪. ফলাফল নির্ধারণ		

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্টকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগিক ক্ষেত্রের শিখনফল অর্জনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা রয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখনফলের মূল্যায়নের জন্য প্রতি বিষয়ের মতো ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়েও মোট নম্বরের ২০% বরাদ্দ রয়েছে। পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত যেসকল কার্যক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে সেগুলো হলো - -

শ্রেণির কাজ

- বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ
- শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণিতে সম্পাদিত সকল কাজই শ্রেণির কাজ। এ কাজের জন্য ৫ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে ৫। শ্রেণি অভীক্ষার জন্য নম্বর হচ্ছে ১০।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যুর মাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজ, ব্যবহারিক কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকাণ্ডসহ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ কতটা অর্জিত হলো তা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। শ্রেণিশিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ প্রতি সাময়িক একবার মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে যে গুণাবলি ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের আওতায় আনা হবে সেগুলো হলো নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতা। (সূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ)

কাজ :

ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব লিখুন

সামষ্টিক মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিহ্নিত শিখন দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য তাৎক্ষণিক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। চূড়ান্ত মূল্যায়নের পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই মূল্যায়ন চলতে থাকবে। শিক্ষকের মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যক্রম সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফলাফল বা পাশ ফেল নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের সফলতা বা অগ্রগতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয় করে গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ফিডব্যাক দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা, এইচএসসি পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়। সাধারণত শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্র মূল্যায়নের জন্যই এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

কোনো নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায় সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হলো সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাস বা ফেল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং তাদের সাফল্যের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয় করে গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে শিখন সহায়তা দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই এ মূল্যায়নকে সত্যিকার অর্থে শিখনের মূল্যায়ন বা (Assessment of Learning) বলা হয়।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে—

- শিক্ষার্থীর গঠনকালীন অগ্রগতি যাচাই;
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ;
- শিক্ষকের মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতকরণ;
- পরবর্তী ধাপের জন্য তৈরি হওয়া;
- শিখনফল অর্জন;
- মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ।

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের সফলতা বা শিক্ষার্থীর অগ্রগতি জানা শিক্ষকের জন্য খুবই জরুরি। শিক্ষার্থীর যে সকল আচরণিক বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতার স্তর অর্জন করা প্রয়োজন তা অর্জন করছে কিনা, না করে থাকলে তা অর্জনে শিক্ষার্থীর জন্য কী কী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা খুঁজে বের করা দরকার। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তার শিখন কার্যক্রমে কতটুকু সফল হচ্ছেন তা জানতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে এ সংক্রান্ত পরিবর্তন জানা সম্ভব।

৮.২: সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি ও ব্লুমস-এর শিখনক্ষেত্রসমূহ

শিক্ষার্থীর সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত একটি শিক্ষার্থীবান্ধব পদ্ধতি হচ্ছে সৃজনশীল মূল্যায়ন বা সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির দুটি অংশ থাকে। একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও অন্যটি বর্ণনা বা ব্যাখ্যামূলক। বহুনির্বাচনি ও ব্যাখ্যামূলক বা সৃজনশীল প্রশ্ন দুটির ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভর উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্র সীমিত। শিক্ষার্থীকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের কোনো তথ্য, সংখ্যা বা ধারণা স্মরণ রাখলেই হবে না বরং তাকে সে তথ্য বা ধারণা বুঝতে হবে, নতুন ক্ষেত্রে বা নতুন কোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে এবং বিচার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করে উত্তরের যৌক্তিকতা দেখাতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে চিন্তা করার এ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর মননে বা মস্তিষ্কে ঘটে চারটি বিকল্প উত্তর থেকে একটিকে সঠিক উত্তর হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করার এ প্রক্রিয়াটি তার নিজস্ব শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মূলত আমেরিকান শিক্ষাবিজ্ঞানীশিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন এস ব্লুম-এর শ্রেণিবিভাগকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার (Cognitive Domain) ক্ষেত্র এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে একদল গবেষকসহ তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেন, যা শিক্ষা বিজ্ঞানে Bloom নামে পরিচিত। শিক্ষার এ ৩টি উদ্দেশ্য বা শিখনক্ষেত্র হলো: ক) বুদ্ধিবৃত্তিক বা চিন্তন ক্ষেত্র (Cognitive Domain) খ) আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain) এবং গ) মনোপেশিজ শিখন ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র

বেঞ্জামিন এস ব্লুম বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন ক্ষেত্রকে ৬টি উপবিভাগে ভাগ করেন। নিচে একটি পিরামিডের সাহায্যে তা দেখানো হলো :



ব্লুম-এর বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন ক্ষেত্রের উপবিভাগ

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain), ব্লুম (১৯৫৬) তার Taxonomy of Educational Objective Handbook 1: Cognitive Domain পুস্তকে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্যকে ৬টি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। এগুলো হলো:

- জ্ঞান (Knowledge)
- অনুধাবন (Comprehension)
- প্রয়োগ (Application)
- বিশ্লেষণ (Analysis)
- সংশ্লেষণ (Synthesis)
- মূল্যায়ন (Evaluation)

এই স্তরগুলো সহজ থেকে জটিল আচরণের অনুক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে।

১. জ্ঞান (Knowledge)

জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করার মানসিক ক্ষমতাকে বুঝায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অত্যন্ত সাধারণ ও সহজ আচরণের প্রকাশ পায়। জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে-

- পরিভাষা (Terminology)
- নির্দিষ্ট তথ্য (যেমন- তারিখ, ঘটনা, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদি)
- রীতি (Convention)
- সাধারণ প্রবণতা ও অনুক্রম (Trends and Sequences)
- শ্রেণিকরণ বা প্রকারভেদ (Classifications or Categories)
- নির্ণায়ক (Criterion)
- পদ্ধতি (Methodology)
- নীতি ও সাধারণীকরণ (Principles and Generalization)
- তত্ত্ব ও গঠন কাঠামো (Theories and Structure)

২. অনুধাবন (Comprehension)

অনুধাবন বলতে কোনো বিষয়ের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে বুঝায়। কোনো তথ্য, ধারণা ও নীতিকে বুঝিয়ে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, চার্ট ও গ্রাফ ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যৎ বাণী করা ইত্যাদি হলো এই শ্রেণির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। যেমন-

- ভাষান্তর (Translation)
- ব্যাখ্যাকরণ (Interpretation)
- অনুবিত্তিকরণ (Extrapolation)

৩.প্রয়োগ (Application)

পূর্বে শেখা কোনো ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্রকে বাস্তবে বা নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ বলা হয়।

৪. বিশ্লেষণ (Analysis)

কোনো সমগ্র বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে পৃথক করা বা ভেঙে ফেলার ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ বলা হয়। চিন্তন বা যুক্তিকরণের এটি একটি প্রক্রিয়া।

- উপাদান বিশ্লেষণ
- সম্পর্কের বিশ্লেষণ
- সংগঠিত নীতি বিশ্লেষণ

৫. সংশ্লেষণ

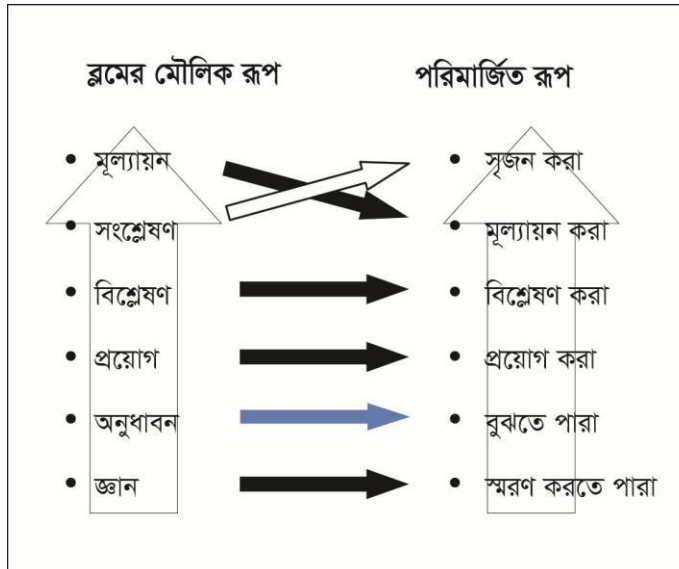
সংশ্লেষণ হলো বিশ্লেষণের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া। কোনো বস্তুর পৃথককৃত অংশগুলোকে একত্রিত করে বস্তুটির সমগ্র রূপদান করার ক্ষমতা হলো সংশ্লেষণ। এটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এই অর্থে এটি চিন্তন ও সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট ধারণা। সংশ্লেষণ কাজের মধ্যে মৌলিকত্ব আছে। কোনো কিছুর গঠন কাঠামো আবিষ্কার এই কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই স্তরের আচরণিক পরিবর্তন হবে সৃষ্টিধর্মী কাজ বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন। এই স্তরের উপবিভাগ হতে পারে।

১. প্রবন্ধ রচনা বা বক্তব্য পেশ
২. পরিকল্পনা প্রণয়ন
৩. তথ্য শ্রেণিকরণ পদ্ধতি

৬. মূল্যায়ন

এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ডোমেইনের সবচেয়ে উঁচু স্তরের উদ্দেশ্য। মূল্যায়ন হলো বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কোনো কিছুর মূল্যমান বিচার করার প্রক্রিয়া। এই বিচারকরণ নির্দিষ্ট কোনো নির্ণায়ক বা মানদণ্ডের আলোকে করা হয়। মূল্যায়ন পরিমাণগত বা গুণগত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে।

বেঞ্জামিন এস. ব্লুম দেখিয়েছেন, শিখন প্রক্রিয়াটি যে ক্ষেত্রেই (Domain) ঘটুক না কেন তা ধাপে ধাপে বা স্তরে স্তরে সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এ বিষয়ে আরও গবেষণা করে ব্লুমের তত্ত্বকে সংশোধন করে নতুন ধারণা প্রদান করেন। ২০০২ সালে এন্ডারসন এটিকে নিম্নরূপভাবে পরিমার্জন করেন:



অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

Krathwohi, Bloom এবং Masia (1964) অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস করেন। এ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, প্রশংসা ও অভিযোজন সংক্রান্ত আচরণ প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো ‘সহজ থেকে কঠিন’ অনুক্রমে নিম্নরূপ বিন্যাস করা হয়েছে।

১. গ্রহণ (Receiving) বা মনোযোগ (Attending)
২. সাড়া প্রদান (Responding)
৩. মূল্যবোধ নিরূপণ (Valuing)
৪. সংগঠিতকরণ (Organizing)
৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ (Characterizing)

১. গ্রহণ বা মনোযোগ

এটি অনুভূতিমূলক ডোমেইনের সবচেয়ে নিচু স্তরের উদ্দেশ্য। গ্রহণ বলতে বোঝায় শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে আদান-প্রদান বা প্রশ্নোত্তর শুনবে বা এর প্রতি মনোযোগী হবে। উপ-শ্রেণিগুলো হলো :

- সচেতনতা (Awareness)
- কোনো কিছু গ্রহণে আগ্রহী (Willingness to receive)
- নিয়ন্ত্রিত বা নির্বাচিত মনোযোগ (Controlled or Selected Attention)

উদাহরণ :

- অপরের কথা মনোযোগের সাথে শোনা।
- ক্লাবের কাজে অংশগ্রহণ করা।
- স্কুল ভবনের কার্যকার্য সম্পর্কে সচেতন থাকা।

২. সাড়া প্রদান

এটা হলো উত্তর প্রদান বা প্রতিক্রিয়া করা। শিক্ষার্থী কোনো উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে চায়। এর পেছনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেষণা কাজ করে। এই শ্রেণির উদ্দেশ্য তিনটি উপ-শ্রেণিতে বিভক্ত :

- সাড়া প্রদানে মৌন সম্মতি (Acquiescence in Responding)
- সাড়া প্রদানে ইচ্ছুক (Willingness to Respond)
- সাড়া প্রদানে তৃপ্তিলাভ (Satisfaction in Response)

উদাহরণ :

- শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা।
- সঠিক উত্তর প্রদানে তৃপ্তি লাভ করা।
- আগ্রহ সহকারে নিজের মতামত ব্যক্ত করা।

৩. মূল্যবোধ নিরূপণ

এই শ্রেণির উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকবে। কারো ইচ্ছা পূরণে সম্মতির পরিবর্তে নিজের প্রবল আগ্রহ ও উদ্যোগ দ্বারা তাড়িত হয়ে মূল্যবোধ অর্জনে অঙ্গীকার করে। এই শ্রেণির তিনটি উপ-শ্রেণি সনাক্ত করা হয়েছে :

- মূল্যবোধের সমর্থন (Acceptance of a Value)
- মূল্যবোধের অগ্রাধিকার (Preference for Value)
- অঙ্গীকার (Commitment)

উদাহরণ :

- ধর্মীয় দর্শনের মূল্য সনাক্ত করতে পারা ।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে সমর্থন করা ।
- স্কুল পরিচালনায় গণতন্ত্রের ভূমিকার প্রশংসা করতে পারা ।

৪. সংগঠিতকরণ

যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে একাধিক মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে, তখন তা মোকাবিলা করার জন্য সে মূল্যবোধকে কোনো একটি বিশেষ রীতিতে বিন্যাস করার চেষ্টা করে। তা না হলে তার আচরণে হয়তো অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পাবে। সংগঠিতকরণ হলো একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থা গঠনের প্রক্রিয়া। এই শ্রেণির আচরণকে দুইটি উপ-শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে :

- মূল্যবোধের ধারণা গঠন (Conceptualization of a value)
- একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থা সংগঠিতকরণ (Organization of a value System)

উদাহরণ:

- একজন নন্দিত নেতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারা ।
- কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক কাজ এবং স্কুলের কাজ বাড়িতে করার ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা ।
- নিজ আচার-আচরণকে স্কুলের নিয়মাবলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারা ।

৫. মূল্যবোধ

মূল্যবোধের শ্রেণিটি হলো অনুভূতিমূলক ডোমেইনের সবচেয়ে উঁচু স্তরের উদ্দেশ্য। এই স্তরে ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করা হয় কতকগুলো নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধ, আদর্শ এবং বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। বিশ্বাস, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবন দর্শন ফুটে ওঠে। এই শ্রেণির দুইটি উপ-শ্রেণি আছে :

- সর্বজনীন সেট (Generalised Set)
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন (Characterization)

উদাহরণ :

- জীবন দর্শন পরিবর্তন করতে পারা ।
- নতুন তথ্যের আলোকে মতামত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করা ।
- মানুষের মূল্য এবং মর্যাদার প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়া ।

মনোপেশিজ ডোমেইন (Psychomotor Domain)

Harrow (1972) মনোপেশিজ ডোমেইনের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধান ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো ‘সহজ থেকে জটিল’ আচরণের অনুক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর কাজের দক্ষতা প্রকাশ করে। এই ছয়টি শ্রেণির প্রত্যেকটিকে উপ-শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। উপ-শ্রেণিগুলোকে আবার অনেকগুলো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। নিচে প্রধান ছয়টি শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করা হলো :

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন-ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন-ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন-ভিডিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization : কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন-তেমন কোনো চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ও ব্লম এর শিখন ক্ষেত্রসমূহের সামঞ্জস্যতা

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বেঞ্জামিন এস ব্লম-এর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মেধার জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবতে শেখায়- তাকে সৃজনশীল করে তোলে। এ কারণেই এ পদ্ধতি সৃজনশীল পদ্ধতি নামে অভিহিত।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখিত ৬টি শিখন ক্ষেত্রের উপবিভাগকে ৪টি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই ৪টি স্তরের প্রশ্ন থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটির জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। এজন্য প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নকে ভাগ করা হয় চারটি অংশে। এই চারটি অংশের উত্তর থেকে শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি ও চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করা সম্ভব হয়। প্রশ্নের প্রথম অংশ জ্ঞানমূলক। এ অংশের জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকে, দ্বিতীয় অংশ অনুধাবনমূলক যার জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে, তৃতীয় অংশ প্রয়োগমূলক, বরাদ্দকৃত নম্বর ৩ এবং সর্বশেষ চতুর্থ অংশটি বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নধর্মী - এজন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ৪।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে পাঠ্যপুস্তকের তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা ও বিষয়বস্তুকে শুধু চিন্তাহীন উত্তর মুখস্থ করলেই চলবে না, এগুলোকে বুঝতে হবে, আত্মস্থ করতে হবে এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ক্ষেত্র ও জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অনুধাবন কীভাবে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি উদ্দীপক থাকে। উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি হতে পারে একটি গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ, অনুচ্ছেদ, গ্রাফ, সারণি, ছবি, কেস স্টাডি, ডায়ালগ, চার্ট ইত্যাদি।

মূল্যায়নকে কার্যকরী, ফলপ্রসূ ও অর্থবহ এবং ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অংশ) উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হবে। উদ্দীপক বিবেচনায় না নিয়ে বা না পড়ে ক ও খ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলেও গ ও ঘ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ব্লম-এর শ্রেণিবিভাগকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রেকে কেন্দ্র করেই। তাই বলা যায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ভিত্তিই বেঞ্জামিন এস ব্লম এর শ্রেণিবিভাগকৃত শিখন ক্ষেত্রেকে নির্ভর করে।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন প্রক্রিয়া বা নিয়ম

- সাধারণত সব সৃজনশীল প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প (Scenario/stem) দিয়ে শুরু হয়।
- দৃশ্যকল্পটি হবে মৌলিক। পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্প তুলে দেয়া যাবে না।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে দৃশ্যকল্প হতে পারে সংবাদপত্র থেকে নেয়া কোনো তথ্য, কোনো চিত্র, ডায়ালগ, সারণি বা চার্ট।
- প্রশ্ন প্রণেতা বা শিক্ষক দৃশ্যকল্পটিকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য করে প্রণয়ন করবেন।
- প্রত্যেক সৃজনশীল প্রশ্ন দক্ষতার কাঠিন্যের ক্রম অনুযায়ী। সাধারণত এ জাতীয় প্রশ্নে ৩ থেকে ৪টি অংশ থাকে।

৮.৩ : সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের গুরুত্ব

শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি জানার জন্য মূল্যায়ন আবশ্যিক। মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রশ্নের মধ্যে সৃজনশীল প্রশ্ন অন্যতম। শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি একটি উপযোগী পদ্ধতি। সৃজনশীল প্রশ্ন একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় গঠিত। একগুচ্ছ শিখনফল যাচাইয়ের জন্য এ প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্নে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা পরিমাপের জন্য চারটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন থাকে। এ প্রশ্নে চিন্তন দক্ষতার নিম্নস্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন) সাথে উচ্চতর স্তরের (প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন) একটি পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। এ প্রশ্নে উচ্চতর দক্ষতা বলতে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন স্তরকে নির্দেশ করে। এ প্রশ্নে দক্ষতার পরিমাপ অনুযায়ী নম্বর বন্টনেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাঠামো। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকে এবং উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) যাচাই করা হয়।

সরকার পাবলিক পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় মুখস্থনির্ভর প্রশ্নপদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রচলের উদ্যোগ নিয়েছে। এ পদ্ধতি চালুর পর্বে পরীক্ষার প্রশ্নে ৮০% নম্বরের বেশি স্মৃতিনির্ভর ও অবশিষ্টগুলো অনুধাবন পর্যায়ের ছিল। প্রশ্নপত্রে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা মূল্যায়ন উপযোগী প্রশ্নের অভাব লক্ষ করা যায়। যার ফলে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষার্থীরা বাজারে প্রচলিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে অসদুপায় অবলম্বন করতো। ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভালো ফলাফল করা অনেক শিক্ষার্থী পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারত না। তাছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়নে কোনো সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকায় প্রশ্ন প্রণেতাগণ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতেন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে কোনো আদর্শ মাপকাঠি না থাকায় বিভিন্ন মূল্যায়নকারীর মূল্যায়নে পার্থক্য দেখা দিত। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের একাধিক অধ্যায় উপেক্ষিত থেকেছে আবার একই অধ্যায় থেকে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীর শিখন কতকগুলো অধ্যায়ের মধ্যে বা কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। এমতাবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয় ফলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা দূর হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্যতা এসেছে। কেননা সৃজনশীল প্রশ্ন মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity), যথার্থতা (validity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), প্রয়োগশীলতা (Applicability), আদর্শায়ন (Standardization) প্রণয়ন করেছে। তাই শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৮.৪ : শ্রেণি অভীক্ষা ও অগ্রগতিযাচাই অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান

শ্রেণি অভীক্ষা শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত স্বল্প সময়ের জন্য একটি পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য কোনো পাঠ বা অধ্যায় সম্পন্ন হলে এ অভীক্ষা নেওয়া হয়। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত, মৌখিক বা ব্যবহারিক যে কোনো ধরনের হতে পারে।

শ্রেণি অভীক্ষা

শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি জানার জন্য মূল্যায়ন আবশ্যিক। কোনো অধ্যায় বা অধ্যায়ের অংশ শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হয়। শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাই করা হয়ে থাকে। বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক হবে। তবে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের জন্য লিখিত ও মৌখিক শ্রেণি অভীক্ষা হতে পারে। শ্রেণি অভীক্ষার প্রশ্ন এমন হওয়া দরকার যেন শিক্ষার্থী মাথা খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ যেন থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমেও শ্রেণি-অভীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

শ্রেণি অভীক্ষার তারিখ ও সময় শিক্ষক শ্রেণিতে পূর্বেই জানিয়ে দিবেন। শ্রেণি অভীক্ষা একটি নির্দিষ্ট পিরিয়ডে সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষক যে কোনো নম্বরের জন্য শ্রেণি অভীক্ষা নিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ১০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। শ্রেণি

অভীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষক নিজে মূল্যায়ন করবেন। Peer Assessment এর মাধ্যমে শিক্ষক এক শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র অন্য শিক্ষার্থীকে দিয়েও মূল্যায়ন করাতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে নম্বরের নির্ভরযোগ্যতা শিক্ষককে নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি সাময়িকে শিক্ষক অনেকগুলো শ্রেণি অভীক্ষা নিবেন। তবে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত তিনটি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বরের রেকর্ড প্রতি সাময়িকে সংরক্ষণ করবেন। শ্রেণি অভীক্ষার নম্বরের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ছক ব্যবহার করা হবে।

শ্রেণি অভীক্ষা মূল্যায়নের মানদণ্ড

ক্ষেত্র	মূল্যায়নের মানদণ্ড
শ্রেণি অভীক্ষা (লিখিত)	সঠিক বা যথার্থ উত্তর পরিভাষা ও সংকেতের যথাযথ ব্যবহার বানান, শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন
শ্রেণি অভীক্ষা (মৌখিক)	ধ্বনি ও বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ শব্দ ও বাক্যের প্রমিত উচ্চারণ
শ্রেণি অভীক্ষা (ব্যবহারিক)	অনুসৃত ধারা/প্রক্রিয়ার সঠিকতা উপকরণ/যন্ত্রপাতির যথার্থতা ফলাফলের সঠিকতা

শ্রেণি অভীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নের সাহায্যে নিলে উত্তরপত্র মূল্যায়নে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করা হলে মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হয়।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

সঠিক পদ্ধতি এবং যথার্থভাবে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে না পারলে মূল্যায়নের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য আমরা সাধারণত নম্বর প্রদান করে থাকি। নানা কারণে এ নম্বর প্রদান সবসময় তার কাক্ষিত মান রক্ষা করতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ, নৈতিকতাবোধ, অজ্ঞতা এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রভাব মূল্যায়নের উপর পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে এতে ফলাফল ও মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা আনা জরুরি।

সঠিক পরিমাপকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উত্তরপত্র সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা ও শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সঠিক প্রতিফলন ঘটে থাকে। পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্দেশনার অভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা বিঘ্নিত হতে পারে। নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষকগণকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা গুরুত্বসহ অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর সঠিক অনুশীলনে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা আনয়ন করবে।

৮.৫ : বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্দেশনা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ ৬ মাসব্যাপী ২টি সাময়িকে ভাগ করা হবে। প্রতি সাময়িক শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে – এটি সাময়িক মূল্যায়ন। বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে সংগঠিত হবে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরি ও অনুসরণ, প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উত্তরপত্র নিরীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে নিয়োজিত করা জরুরি। ত্রুটিবৃত্ত বা সমিতি থেকে সংগৃহীত প্রশ্নপত্র সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষকগণের সৃজনশীলতা ও প্রশ্নপ্রণয়নের দক্ষতা কমে যায়। মূল্যায়ন যথার্থতা হারায়। শুরুতে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে ২টি সাময়িকের জন্য বণ্টন করবেন। বিষয়ের কার্যদিবসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অধ্যায়সমূহকে বণ্টন করতে হবে। শিক্ষকগণ সে অনুসারে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

প্রথম সাময়িকে মূল্যায়নকৃত অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তু দ্বিতীয় সাময়িকে মূল্যায়নে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরত থাকতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের আঞ্চিক দিক

প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। এই চারটি প্রশ্ন পর্যায়ক্রমে কাঠিন্যের ক্রম অনুযায়ী থাকে। প্রথমে জ্ঞানমূলক পরে অনুধাবনমূলক এবং পরবর্তীতে উদ্দীপকের আলোকে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হলো ১০।

সৃজনশীল প্রশ্নের একটি উদাহরণ-নিম্নে উল্লেখ করা হলো

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব আবু রায়হান তার ২০ জন বন্ধু মিলে গাজীপুরে একটি টেরিটাওয়েল তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। তাদের প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। পরবর্তী বছরে তারা বিদেশে পণ্য রপ্তানির আদেশ পেলেন, ফলে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন পড়ে। তারা মূলধন বৃদ্ধির জন্য জনগণের নিকট থেকে মূলধনের অংশ সংগ্রহের জন্য রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে আবেদন করেন।

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী?

খ. স্থান নির্বাচন এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. জনাব আবু রায়হানদের প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবসায়ের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের পরিবর্তিত ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোটি মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে- বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখেও ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ('ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ('ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরেও পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ন্যায় বহুনির্বাচনি প্রশ্নের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর যাচাই করা যায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক বা নির্দেশনা (stem/instruction) থাকে এবং তার আলোকে কয়েকটি বিকল্প উত্তর (options) থাকে। বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটি সঠিক উত্তর এবং অন্যগুলো বিক্ষিপক। এগুলো সঠিক উত্তর নয়। এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যেন শিক্ষার্থীরা সেই বিক্ষিপকও সঠিক বলে মনে করে এবং (যাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই) উত্তর দেওয়ার জন্য আকৃষ্ট হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক -

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে;
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে;
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে;
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না);
- 'হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে);
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে;
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বিকল্প উত্তরসমূহ -

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে;
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে;
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে);
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে);
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে);
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সেক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়);
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনোটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য পরিহার করবে।

একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছ সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো নির্দিষ্ট ক্রম (Sequence) না থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও দক্ষতার স্তর

তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকবে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন(Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুলোতে নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নমুনা

১। নিজের কর্মসংস্থান নিজে করাকে কী বলা হয়?

- ক. কুটির শিল্প
- খ. ক্ষুদ্র শিল্প
- গ. আত্মকর্মসংস্থান
- ঘ. একমালিকানা ব্যবসায়

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন(Multiple Completion MCQ)

পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং এর পর পরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতরদক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২। মাইক্রোজিনিং-এর অন্তর্গত বিষয় হলো-

- i. প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা
- ii. প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনকতা নির্ধারণ
- iii. প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দর্শন বিবেচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোন প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন(Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem /Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপত্রে নিজে উদ্দীপক তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও, টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে, যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তনচন চাকমা তার বাবা, মা ও দুই ভাইবোন মিলে কোনোরূপ প্রশিক্ষণ ছাড়াই বাড়ির দুটি কক্ষে ‘খামি’ বানানো শুরু করলেন, কিছুদিন ব্যবসায় ভালো চললেও ‘খামির’ ডিজাইন একই রকম হওয়ায় বাজারে চাহিদা কমে যায়, এতে তিনি বেশ চিহ্নিত হয়ে পড়লেন।

১। তনচন চাকমাদের ব্যবসায়টি কোন ধরনের?

- ক. কুটির শিল্প
- খ. হস্ত শিল্প
- গ. ক্ষুদ্র শিল্প
- ঘ. বস্ত্র শিল্প

২। তনচন চাকমাদের ব্যবসায়ের ব্যর্থতার কারণ—

- i. ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতার অভাব
- ii. কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার স্বল্পতা
- iii. স্বল্প ও অপরিপূর্ণ মূলধন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i,ii ও iii

সৃজনশীল ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরির কৌশল

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হলে অবশ্যই উদ্দীপক ব্যবহার করতে হবে। অজানা পরিস্থিতিতে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ও অনুধাবন (তথ্য, ধারণা, নিয়ম, বিধি, সূত্র ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর ব্যবহার করতে পারাই হলো প্রয়োগ দক্ষতা। পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে শিক্ষার্থী নতুন পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ যা নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি উপস্থাপন করার মাধ্যমে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা দেখাতে পারে। এছাড়াও বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তির ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে ও মূল্যায়ন করতে পারাও উচ্চতর দক্ষতা। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি আনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উদ্দীপকের প্রয়োজন পড়ে না এমন প্রশ্নে উদ্দীপক ব্যবহার সময় ও শ্রমের অপচয়মাত্র। নিচের কৌশল বিবেচনায় রাখলে আশা করা যায় মানসম্মত প্রশ্ন ও কার্যকরী উদ্দীপক তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রশ্নের উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে। উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে।
- উদ্দীপক হবে মৌলিক, এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে।
- একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না।

৮.৬ : উত্তরপত্র মূল্যায়ন, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা, নিরীক্ষণ ও পরিশোধন

উত্তরপত্র মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র যতোই মানসম্পন্ন হোক না কেন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে যথার্থতা আনতে না পারলে তার কার্যকারিতা ও ফলপ্রসূতা হারায়। এজন্য প্রয়োজন উত্তরপত্র মূল্যায়নে যথার্থতা আনয়ন করা। উত্তরপত্র মূল্যায়নে যথার্থতা আনতে হলে মূল্যায়নে সামঞ্জস্যতা (consistency) ও সমরূপতা (uniformity) নিশ্চিত করতে হবে।

সামঞ্জস্যতা (Consistency)

মূল্যায়নকারীর উপর তার মেজাজ, আবহাওয়া ইত্যাদির প্রভাব না পড়ে যদি একইভাবে সকল শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন তখন মূল্যায়নে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হয়।

সমরূপতা (Uniformity)

যখন একই পরীক্ষার উত্তরপত্র একাধিক মূল্যায়নকারী মূল্যায়ন করেন তখন এক পরীক্ষাকক্ষের মূল্যায়ন অন্য পরীক্ষার মূল্যায়নের মতো হয় না। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একজন এক এক রকমের নম্বর প্রদান করেন। এক পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষকের মূল্যায়নে তারতম্য ঘটে থাকে- তাতে সমরূপতা বিঘ্নিত হয়।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

যে সকল সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়নে পরীক্ষকের মানসিক গড়ন, পরিবেশ, সময়, আবহাওয়া ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে সেখানে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান করা জটিল কাজ।

নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তঃপরীক্ষক (Inter Examiner) ও অন্তঃপরীক্ষক (Intra Examiner) এ দুধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায় যা মূল্যায়নে সামঞ্জস্যতা ও সমরূপতা আনয়নের বাধাস্বরূপ।

নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানে প্রতিবন্ধকতা :

শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যে সকল প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদান ব্যক্তির পরিবেশ, মানসিক গড়ন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ভূমিকা রয়েছে সেখানে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তঃপরীক্ষক (Inter examiner) ও অন্তঃপরীক্ষক (Intra Examiner)- এ দুধরনেরই প্রভাব পড়তে পারে। আন্তঃপরীক্ষক প্রভাব বলতে দু'জন বা ততোধিক পরীক্ষকের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির কারণে সমমানের উত্তরপত্র মূল্যায়নে যে পার্থক্য হয়ে থাকে সেটিকে বুঝায়। অন্যদিকে একই পরীক্ষক যখন সময়ের ব্যবধানে অথবা পরিবেশগত কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে তার মনমানসিকতার পরিবর্তন ঘটে তার প্রভাব উত্তরপত্র মূল্যায়নেও ঘটে। সেটিকে অন্তঃপরীক্ষক প্রভাব বলা হয়।

উভয়ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পরীক্ষক। নিচে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান প্রতিবন্ধকতা দৃষ্টি করে তা উল্লেখ করা হলো :

পূর্ব ধারণার প্রভাব (Halo effect)

পরীক্ষক তার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী তার পূর্ব ধারণার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন। এর প্রভাব শিক্ষার্থীর ফলাফলের ক্ষেত্রে নেতিবাচক বা ইতিবাচক যাই হোক না কেন তার ফলে মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ হয় না।

ধারাবাহিকতার প্রভাব (Carryout effect)

যখন কোনো শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রের কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করা হয় তখন পরীক্ষক ধরে নেন যে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর এ প্রশ্নের উত্তরের কাছাকাছি বা একই রকমই হবে। উত্তর ভালো বা খারাপ হলেও একই ধরনের নম্বর দেওয়ার এই মানসিকতা মূল্যায়নে প্রভাব ফেলে।

কম নম্বর দেওয়ার প্রভাব (Scale shrinking effect)

শিক্ষার্থী যত ভালোই উত্তর করুক না কেন কোনো কোনো পরীক্ষকের কম নম্বর দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হয় না।

প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণা (Stereotyping)

যদি কোনো পরীক্ষক একই মানের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে থাকেন তবে তার মধ্যে একই ধরনের নম্বর প্রদানের প্রবণতা কাজ করে। খুব খারাপ মানের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে করতে একটি ভালো মানের উত্তরপত্রেও কম নম্বর দেওয়ার একটি প্রবণতা কাজ করে। আবার খুব ভালো মানের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে করতে মূল্যায়নকারী উচ্চনম্বর দেওয়া অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে নিম্নমানের উত্তরপত্রেও উচ্চনম্বর দেওয়া হয়ে যায়।

কাজ:

ক্ষেত্র	উত্তরপত্র মূল্যায়নের আন্তঃপরীক্ষক ও অন্তঃপরীক্ষক উভয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।
পূর্ব ধারণার প্রভাব	
চলমান বা ধারাবাহিকতার প্রভাব	
নম্বর সংকোচন করার প্রবণতা	
বেশি নম্বর বা কম নম্বর দেওয়ার প্রবণতা	
দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য	
পেশাগত দক্ষতার প্রভাব	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে প্রশ্নপত্র প্রণেতাকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guide Line/Scheme/Rubric and Model Answer) তৈরি করতে হয়। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের দক্ষতা স্তর একটি কলামে এবং পাশের কলামে প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা দেওয়া হয়।

ছক

প্রশ্নের নম্বর	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা

প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাছে যে দক্ষতা স্তর প্রত্যাশা করা হচ্ছে সেই প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণে নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। প্রশ্নের ‘খ’ অংশে ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। ‘গ’ অংশে ৩; ২ নম্বর অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং ‘ঘ’ অংশে ৪, অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। কোনো প্রশ্নের উত্তরে ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিলে অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর না দিলে শূন্য (০) পারে।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর লেখার প্রয়োজনীয়তা

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণের ফলে প্রশ্ন প্রণয়নকারী প্রশ্নের ত্রুটি উৎখাত করতে পারেন। ত্রুটিমুক্ত করে একটি সঠিক প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করে থাকে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ভুল, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। নমুনা উত্তর লেখার সময় একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে সতর্কতা

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর ব্যবহার করে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীকে মাথায় রাখতে হবে— প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা ছবছ একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্য বিন্যাস এবং উপস্থাপন কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়তো তা চিন্তা করতে পারেননি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান, তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে— এমনটা ভাবা যাবে না। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সঠিক উত্তর থেকে পরীক্ষক তার চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী কয়েকটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারে। আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ সনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ ও ঘ) দেখে দেখে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

নিরীক্ষণ ও পরিশোধন (Scrutiny and Moderation)

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পর নির্ভুল ও যথাযথ একটি প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণের পূর্বে তা অধিকতর যাচাই বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াই পরিশোধন নামে অভিহিত। অনেক সময় প্রশ্নপত্র প্রণেতার চোখে যে ভুল ধরা পড়ে না তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির চোখে ধরা পড়ে। এ কারণে প্রণীত প্রশ্নপত্র ও পরিশোধন করা হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন উভয়ই নিরীক্ষণ ও পরিশোধনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিশোধন প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রতিটি প্রশ্ন যথার্থ কিনা। পরিশোধনের সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে;

- উদ্দীপক অবশ্যই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য যথোপযুক্ত হতে হবে কিন্তু এমন দীর্ঘ হবে না যাতে শিক্ষার্থীদের পড়তে অনেক সময় ব্যয় হয়;
- অপ্রয়োজনীয় বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো তথ্য উদ্দীপক অথবা প্রশ্নের কোনো অংশে (Sub parts of the Question) থাকবে না।
- সৃজনশীল প্রশ্নে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার চেয়ে চিন্তন দক্ষতা বিভিন্ন স্তর মূল্যায়নের উপর যাতে বেশি গুরুত্ব পায়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার সকল স্তর প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায় কিনা তার ভিত্তিতে প্রশ্নের যথার্থতা নিরূপণ করা।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকে এবং এর উপর ভিত্তি করে চারটি অংশে বিভক্ত প্রশ্ন (Sub parts of the Question) থাকে। উদ্দীপক লিখিত কিছু হতে পারে আবার সারণি, গ্রাফ/লেখনি, ছবি অথবা ডায়াগ্রাম আকারে হতে পারে অথবা এগুলোর সমন্বিত (combination) রূপও হতে পারে।
- ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের একটি অধ্যায়ের আলোকে অথবা একাধিক অধ্যায়ের সমন্বয়ে উদ্দীপক গঠিত হতে পারে।
- শব্দের ব্যবহার, বাক্যগঠন এবং ধারণা সংগঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা যাতে না থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন এমন কৌশলে প্রণয়ন করতে হবে বা একটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের মধ্যে প্রাবরণ (overlapping) হবে না। প্রশ্নপত্রের উত্তরের মধ্যেও প্রাবরণ না থাকা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। আবার প্রয়োজনে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতি অংশের জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশোধন করতে হতে পারে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই সিলেবাস এবং কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বণ্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।
- অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে তথ্যের ভিন্নতা আছে এমন প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন যথাসম্ভব কম থাকবে।
- প্রশ্ন সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ-হাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষিপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট পরীক্ষার্থীর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনোভাবেই যেন উত্তর/‘উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত’ না থাকে।
- বর্তমান সময়ের বিবেচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু/শিখনফল মূল্যায়ন করার জন্য কোনো প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। অর্থপূর্ণ শিক্ষা অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- একটি প্রশ্নপত্রের সেটের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কঠিনতার বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোনো অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো উদ্দীপক বা প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

পরিশোধকালে নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের ৬০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৪০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।

নমুনা প্রশ্ন

ক. সংক্ষিপ্ত - উত্তর প্রশ্ন

- ১। মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়?
- ২। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী কী?
- ৩। শ্রেণি অভীক্ষা কী?
- ৪। শিখন অগ্রগতি যাচাই কাকে বলা হয়
- ৫। চিন্তন দক্ষতা কী?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
খ. সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ভিত্তি ব্যাখ্যা করুন।
২. ক. শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সৃজনশীল প্রশ্নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
খ. ব্লুমের শিখন ক্ষেত্রসমূহ (Domain) ব্যাখ্যা করুন।
৩. ক. সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক প্রয়োজন কেন?
খ. উদ্দীপক তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।
৪. ক. উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষক কেন প্রভাবিত হন? এ প্রভাব দূর করার উপায় ব্যাখ্যা করুন।
খ. প্রশ্নপত্র পরিশোধন কেন প্রয়োজন? প্রশ্নপত্র পরিশোধনে যে যে বিষয় বিবেচনা করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট-৯ : ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে পেশাগত উন্নয়ন

শিক্ষকতা একটি মহান ও সর্বজন স্বীকৃত পেশা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতা পেশা সবচেয়ে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এই পেশার উপযোগী করে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত, চারিত্রিক, দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হলো পেশাগত মনোভাব। আর পেশাগত মনোভাব উন্নত করার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন প্রতিফলন অনুশীলন ও কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন সাধন করা। এ অধ্যায়ে শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিকসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে-

৯.১ ধারাবাহিক/অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন ও পেশাগত উন্নয়ন কৌশল

৯.২ প্রতিফলনমূলক অনুশীলন

৯.৩ কর্ম সহায়ক গবেষণা

৯.৪ শিক্ষা সফর

৯.১ ধারাবাহিক/অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ধারণা

সাধারণত উন্নয়ন বলতে বোঝায় বিরাজমান অবস্থার কাক্ষিত পরিবর্তন সাধন করা। আর পেশাগত উন্নয়ন হলো যিনি যে পেশায় নিয়োজিত আছেন সেই পেশার বিরাজমান অবস্থার কাক্ষিত পরিবর্তন সাধন। পেশাগত উন্নয়ন কথাটির বিস্তৃতি ব্যাপক। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন হলো সঠিকভাবে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে পেশাদারের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আধুনিক ও যুগোপযোগী বিষয় জ্ঞান ও তার বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন। এর জন্য একজন শিক্ষকের সর্বাত্মক প্রয়োজন জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা এবং শিক্ষার্থী প্রীতি। একজন শিক্ষকের অবশ্যই পেশাগত বিষয়াবলি, শিক্ষা ও সাধারণ বিষয়াবলিতে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে। পেশাগত উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। একজন শিক্ষককে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ধারাবাহিকভাবে এ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে বোঝায় পেশাগত বিষয়ে চাহিদার আলোকে ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের সাথে সুনিপুন কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পাদনের দায়িত্বভার গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে শিক্ষক তাঁর সৃজনশীল চিন্তা ও বুদ্ধি দ্বারা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন দক্ষতা গড়ে তুলতে পারেন। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকের সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার উন্মেষ সাধন হয়। এর প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষক কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে কোন দক্ষতা গড়ে উঠবে সে বিষয়ে সজাগ থাকেন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক নিজে স্বপ্ন দেখেন এবং অন্যদের স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহিত করেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে উদ্যোক্তার গুণাবলি বা আত্মকর্মসংস্থান অথবা মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন বিষয়বস্তুকে বাস্তব উপকরণ ও উপমা দিয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর ভিতরে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন তৈরি হবে। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষককে নির্ধারিত কাজের জন্য প্রস্তুত করা। তাছাড়া বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে চাহিদা, সম্পদ ও সময়ের স্বল্পতার বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারণা ও উদ্ভাবিত কৌশল সম্পর্কে অবহিত করে কার্যকর কর্মসম্পাদনে সক্ষম করে তোলা।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় সংযোজন, শিখন-শোখানো কার্যক্রমে নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন ও উন্নয়ন সময়ের দাবি। এ সকল পরিবর্তনের সফল ও কার্যকর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন অপরিহার্য।

- শিক্ষকদের সময়মত কাজ করার দক্ষতা অর্জন ও কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন;

- ভবিষ্যতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের কিংবা বহুমুখী দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী করে নিজেকে তৈরি করার জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন;
- কর্মের সঠিক ও ব্যাপক ধারণা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন;
- সীমিত অর্থ সম্পদ ও স্বল্প জন সম্পদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব

- শিক্ষকের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- উপস্থাপন কৌশলের উন্নয়ন সাধন;
- সময় সচেতনতা অর্জন;
- কার্যকর শিখন পরিচালনার জ্ঞানের উন্নয়ন সাধন;
- বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন;
- পেশাগত সুসম্পর্ক সৃষ্টি;
- সার্বিক দিক থেকে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি;
- শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিতকরণ;
- শিক্ষার্থীর সঠিক মূল্যায়নের দক্ষতা অর্জন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন।

পেশাগত উন্নয়ন কৌশল

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিজেকে তৈরি করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে কর্মসম্পাদনের দক্ষতা, যোগ্যতা, ভবিষ্যতে কঠিনতর এবং ব্যাপকতর কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণের সক্ষমতা অর্জিত হয়। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

- বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ
- বিভিন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী
- প্রতিফলন অনুশীলন

বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিক্ষক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা নিয়ে থাকেন। এ প্রশিক্ষণ কোনোটি দীর্ঘমেয়াদি আবার কোনোটি স্বল্পমেয়াদি হতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠনীয় বিষয় কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে, শিখনসহায়ক শিক্ষোপকরণ কখন, কীভাবে ব্যবহার করা যায়, শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে কীভাবে পাঠে সম্পৃক্ত করা যায়, কীভাবে শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ন করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব হয়। বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ দু'ধরনের হতে পারে।

- কর্মকালীন প্রশিক্ষণ
- কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণ

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

কর্মরত অবস্থায় যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বা গ্রহণ করা হয় তার নাম কর্মকালীন প্রশিক্ষণ। এতে কর্মীরা নিজস্ব কর্ম পরিবেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত নিজ প্রতিষ্ঠান বা সমজাতীয় অন্য প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিক্ষক কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপস্থাপন দক্ষতা, শিক্ষার্থীকে শিখন-শেখানোর দক্ষতা, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারের দক্ষতা এবং শিক্ষার্থী সঠিক মূল্যায়ন দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

এ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কর্মক্রমাবর্তন, কর্ম নির্দেশনা, জ্যেষ্ঠ কর্মীর অধীনে সহকারী বা শিক্ষানবিশ হিসাবে কর্মরত থাকা, বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করা ইত্যাদি। কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সাধারণত অনুশীলনভিত্তিক এবং স্বশিক্ষণে সহায়ক। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন- তত্ত্বাবধায়ক, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক বা প্রশিক্ষিত রিসোর্স পার্সনবৃন্দ।

কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণ

প্রকৃত কর্মপরিবেশের বাইরে নিয়ে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাকে বলা হয় কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণ। শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে যাতে কাজের চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে সেজন্যে কর্ম পরিবেশের বাইরে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য টিকিউআই প্রকল্পের পরিচালনায় এসটিসি ও সিপিডি কোর্স উল্লেখ্যযোগ্য কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণ। তাছাড়া স্বজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণ। এ ধরনের প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও দক্ষতার অনুশীলন করা হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় শিক্ষক বিভিন্ন কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় এসে পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে যুগোপযোগি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক দ্বারা এ ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। কর্মমুক্ত প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত থাকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, কর্মশিবির, ভূমিকাভিনয়, সেমিনার, চলচ্চিত্র/টেলিভিশন প্রদর্শনী, কেস স্টাডি, আলোচনা, শিক্ষা সফর ইত্যাদি।

বিভিন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

শিক্ষার প্রধানতম কাজ হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন করা। বস্তুগত সম্পদের উন্নয়ন আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে দরকার শিক্ষা। শিক্ষা অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষক নিজেকে উক্ত কাজের উপযোগী করে তৈরি করতে পারেন। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রধান উপাদান হলো ব্যক্তির দৈহিক সামর্থ ও মানসিক ক্ষমতা। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে নিজের দৈহিক সামর্থ ও মানসিক সক্ষমতার প্রতি সচেতন হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করবেন।

প্রতিফলন অনুশীলন

শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রতিফলন অনুশীলন। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেই নিজের প্রতিবন্ধ দেখে ভুলত্রুটি সংশোধন করে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। এ জন্য শিক্ষকের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রয়োজন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষককে নিজের পেশাগত উন্নয়নের জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। বর্তমান সময়ের সর্বশেষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হয়। এ জন্য দরকার পেশাগত দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকার। একজন শিক্ষক জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। পেশাগত উন্নয়নের জন্য তাঁর নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এর জন্য তাঁকে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলো হলো :

- পাঠ্যপুস্তক সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন;
- পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল পাঠ করে;

- গবেষণা প্রতিবেদন;
- সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিতর্ক দলীয় আলোচনার আয়োজন করা;
- অভিভাবকদের সভা আহ্বান করে;
- শিক্ষা সংবাদ, শিক্ষা বার্তা, সাময়িকী ইত্যাদি পাঠ করে;
- শিক্ষা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে;
- শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ করানোর মাধ্যমে;
- রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, চলচ্চিত্র, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, শিক্ষক বাতায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে;
- বিদ্যালয় পাঠাগার ও এলাকার পাঠাগার ব্যবহার করে;
- সহকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করে;
- প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে।

উপরোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক নিজের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করবেন। একই সাথে তিনি তাঁর কার্যক্রম নিয়ে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হবেন।

৯.২ প্রতিফলনমূলক অনুশীলন

জনাব সুলতান একজন ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষক। তিনি প্রতিদিন তাঁর পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে পাঠ নিয়ে পরিকল্পনা করেন। তার পাঠ পরিচালনার কার্যক্রম শেষ করার পর তিনি পাঠের সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং তার প্রেক্ষিতে পরবর্তী দিনের কার্যক্রমের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করেন। এভাবে তিনি প্রতিদিনের পাঠের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁর দুর্বলতাগুলো কাটানোর জন্য তিনি অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এছাড়া তিনি রেডিও টেলিভিশন ও কম্পিউটারের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়গুলো ভিজিট করে, আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের দুর্বলতা কাটানোর পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজের দক্ষতাগুলো চর্চার মাধ্যমে অর্জন করেন।

প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা, এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিখন-শিখানো কার্যক্রম সংক্রান্ত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টায় একজন কর্মরত শিক্ষক প্রতিদিন তার নিজের পাঠপরিচালনার সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে চর্চার মাধ্যমে দিকগুলো প্রতিষ্ঠিত করাতে পারেন। পাঠ পরিচালনার দুর্বল দিকগুলোও তিনি এভাবে চর্চার মাধ্যমে পরিহার করতে পারেন। সুতরাং শিক্ষকতায় যোগ্যতা বা দক্ষতাগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার অনুশীলনকে প্রতিফলন অনুশীলন বলা হয়। প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষক নিজের ভালো দিকগুলো প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি নিজ প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকদের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে তাদের ভালো দক্ষতাগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক সবসময় প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের অথবা অন্য শিক্ষকের দক্ষতা বা যোগ্যতাগুলোকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে দক্ষ শিক্ষক হিসাবে গড়ে উঠতে পারেন তাকে প্রতিফলন অনুশীলন বলে। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আদর্শ শিক্ষক হিসাবে নিজেকে তৈরি কতে পারেন। এটি মূলত একজন শিক্ষকের ভালো গুণাবলি আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়া। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক প্রতিফলন ডাইরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে পারেন এবং পরবর্তীতে অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা আয়ত্তে আনতে পারেন।

প্রতিফলন অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য

- প্রতিফলন অনুশীলন হলো শিখন-শেখানোর একটি মাধ্যম;
- এটি এক ধরনের চিন্তন অভিজ্ঞতার ফসল কাজে পরিণতকরণ;
- এটি মূলত একজন শিক্ষকের শিখন-শেখানো দক্ষতা আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়া;

- প্রতিফলন অনুশীলন চর্চা ও অনুশীলন ভিত্তিক বিষয়;
- এটি হলো আত্মসমালোচনামূলক ও আত্মশুদ্ধিমূলক একটি প্রচেষ্টা;
- এর মাধ্যমে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চর্চা করা হয়;
- এটি তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার যোগসূত্র অনুশীলনের প্রক্রিয়া।

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন অত্যাবশ্যকীয় কারণ

- এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক দক্ষ শিক্ষক হয়ে গড়ে ওঠে;
- নিজ পেশার প্রতি সচেতনতা বোধ সৃষ্টি হয়;
- পেশার সাথে সেবা করার সম্পর্ক তৈরি হয়;
- পাঠে নিয়মিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের অভ্যাস গড়ে ওঠে;
- নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে ওঠে;
- এর মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকের ভালো গুণগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়;
- প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা আসে;
- ব্যক্তির কাজকর্ম অর্থবোধক হয়;
- মুদ্রাদোষগুলো পরিহার করার সুযোগ পায়;
- ক্রমাগতভাবে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- কাজে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সার্থকতার সাথে কাজ করতে পারে;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়;
- প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাজীবীদের পক্ষে বিভিন্ন সুপ্ত বা লুকায়িত জ্ঞানের চর্চা করা সহজ হয়;
- প্রতিফলন অনুশীলন নিজের সম্পর্কে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুধাবন করতে শেখায়। ফলে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করে।

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রকারভেদ

Donald schon 1987 বলেছেন প্রতিফলন অনুশীলন দু'প্রকার-

- ১। কাজের মধ্যে প্রতিফলন
- ২। কাজের উপর প্রতিফলন

কাজের মধ্যে প্রতিফলন

অনেক সময় কোনো কোনো ব্যক্তি কাজ করার সময় কাজের গুণগত মানের ব্যাপারে সচেতন থাকে। একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আত্মবিশ্বাসী চর্চাকারী মূলত এ ধরনের প্রতিফলন অনুশীলন করে থাকে। সাধারণত একজন পেশাজীবী এ কাজের ক্ষেত্রে-

- নিজের কাজের নিজেই সমালোচনা করেন।
- কাজের ধাপের কথা চিন্তা করেন।
- ভবিষ্যতের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।
- কাজের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেন।

কাজের উপর প্রতিফলন

সাধারণত প্রতিফলন অনুশীলন বলতে কাজের উপর প্রতিফলনকেই বোঝান হয়। ব্যক্তি কোনো কাজ শেষ করার পর সে কাজের সবল দিক ও দুর্বল দিক নিয়ে ভেবে তার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টাকেই সেই কাজের উপর প্রতিফলন বলা হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক শিখন-শেখানোর কাজ শেষ করার পর নিজে কক্ষে এসে শ্রেণিকক্ষে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে ভাববেন এবং প্রয়োজনে অন্য সহকর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী দিনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এবং কাজের গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। মূলত এ কাজটিই হচ্ছে কাজের উপর প্রতিফলন।

প্রতিফলন অনুশীলনের বিবেচ্যবিষয়

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য সর্বপ্রথম তার শ্রেণিকক্ষকে বিবেচনায় আনবেন। শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাসের কোনোরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকলে তিনি তা করতে পারেন। কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠ উপযোগী মানসিক পরিবেশ গঠন করেছেন, তার পর্যবেক্ষণকৃত দক্ষ শিক্ষক কীভাবে আসন বিন্যাস করেছেন, কীভাবে কোনো শর্ত অনুযায়ী দলগঠন করেছেন, দলগত কাজ কী দিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় কীভাবে শ্রেণি তদারকি করেছেন এবং কীভাবে পাঠের সারাংশ আদায় করেছেন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

এছাড়া তিনি নিজে বা পর্যবেক্ষণকৃত দক্ষ শিক্ষক কী কী উপকরণ ব্যবহার করেছেন, কোনো সময় ব্যবহার করেছেন, ব্যবহার করার পর সেটি কোথায় রেখেছেন, উপকরণ দেখতে কেমন ছিল, লেখার সাইজ শ্রেণি উপযোগী ছিল কিনা, শিক্ষক নিজে উপকরণ প্রদর্শন করেছেন নাকি এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করিয়েছেন ইত্যাদি দিকের পর্যবেক্ষণ প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য বিবেচনায় আনবেন।

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তার নিজের বা পর্যবেক্ষণকৃত দক্ষ শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তিনি কী ধরনের প্রশ্ন করেছেন, কীভাবে প্রশ্ন করেছেন, কাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার পর কি করেছেন ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য শিক্ষক বিবেচনায় আনবেন।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক নিজে বা পর্যবেক্ষণকৃত দক্ষ শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছেন, পুরো শ্রেণিকে মূল্যায়নের আওতায় এনেছেন কিনা, বাড়ির কাজ প্রদান করেছেন কিনা, বাড়ির কাজটি সঠিক ছিল কিনা এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনবেন। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের পাঠ উপযোগী মানসিক পরিবেশ গঠন, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক, সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক প্রতিফলন অনুশীলন করবেন।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন

- ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক নিয়মিতভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সবল দুর্বল দিক একটি ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পূর্ব পাঠের দুর্বল দিকগুলো পরিহার করে পরবর্তী দিন পাঠ দিবেন।
- পূর্ব পাঠের সবল দিকগুলো মনে রাখবেন এবং পাঠের মধ্যে পুনরায় প্রয়োগ করবেন।
- দক্ষ ও সার্থক শিক্ষকের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে তার পাঠের সবল দিকগুলো আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবেন।
- ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে এ কাজগুলো করবেন।
- শিক্ষককে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের সম্পর্কে আত্মমূল্যায়ন করতে হবে। আর তার আত্মমূল্যায়নের নিরিখে নিজের উন্নয়ন করবেন।

এভাবে কাজ করে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজের দক্ষতাগুলো আয়ত্তে আনতে পারেন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

৯.৩ কর্মসহায়ক গবেষণা

বর্তমান বিশ্ব পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষা জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার। সমাজের জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এসব পরিবর্তিত পরিস্থিতির সমস্যা সমাধানের উপযোগী উপায় খুঁজতে সহায়তা করে কর্মসহায়ক গবেষণা।

কর্মসহায়ক গবেষণা কথাটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কাজের সহায়তা করার জন্য কোন সমস্যা সমাধানের জন্য পুনঃ অনুসন্ধান। সাধারণভাবে কোনো শিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিন কিছু সমস্যার সন্মুখীন হতে পারেন। এসব সমস্যা সমাধান শিক্ষক নিজে অথবা অন্যের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে করে থাকেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকেন। শিক্ষক তার কর্মকে সহায়তা করার জন্য চিন্তা করে একটি পন্থা বা উপায় আবিষ্কার করে কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে থাকেন। শিক্ষকের প্রতিদিনকার পদক্ষেপ কোন গবেষণা নয় এগুলো বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম।

‘কর্মসহায়ক গবেষণা’ নামের মাঝেই কাজের পরিচয়। এই গবেষণা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কর্মের বা কাজের মাধ্যমে গবেষণা। এক্ষেত্রে গবেষণা ও কর্মসম্পাদন একত্রে চলে। এ কাজটিতে কোনো পেশাদার ব্যক্তি এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে অথবা কোনো বিশেষ গবেষণার সাথে সম্মিলিতভাবে পেশাগত বা সামাজিক সমস্যা সমাধান বা উন্নয়নকল্পে উদ্ভাবনামূলক কার্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে। সুতরাং যে গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তৎক্ষণিকভাবে পয়োগের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধান বা সমাজের চলিত রীতির পরিবর্তন করা হয় তাকেই কর্মসহায়ক গবেষণা বলে। এ ধরনের গবেষণা সবসময় মূল কার্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবেশে থেকে পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বিবেচনা করে কিছু কার্যক্রম গবেষণামূলকভাবে পরিচালনা করা হয়। পরিশেষে বলা যায় কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা কর্ম পরিবেশের মধ্যেই গবেষণা করে সমাধানের উপায় বের করা হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারেন। তিনি শিখন-শেখানোর কার্যের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন করার চেষ্টা করেন। তিনি একদিকে গবেষক অন্যদিকে শিক্ষক হিসাবে কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে কর্মপদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে পারেন।

কর্মসহায়ক গবেষণার বৈশিষ্ট্য

- সাধারণত কী ঘটনা ঘটেছে কেন ঘটেছে এবং কীভাবে সমাধান করা যায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার লক্ষ্যে কর্মসহায়ক গবেষণার কাজ করা হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো সমস্যা সমাধান কিভাবে করে তার লক্ষ্যেই এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। মূলত স্থানীয় পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত করা ও তার সমাধান করা এর কাজ;
- কর্মসহায়ক গবেষণা সহযোগিতামূলক কার্যক্রম এখানে গবেষক ও পেশাদার ব্যক্তি একত্রে কাজ করে। শিক্ষকতা পেশার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং বহিরাগত গবেষকের মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্য প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। উক্ত গবেষক সহযোগী হয়ে কাজ করে থাকেন;
- এই গবেষণা অংশগ্রহণকেন্দ্রিক। সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক সকলেই অংশগ্রহণ করেন;
- কর্মসহায়ক গবেষণা সর্বদা ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট;
- এই গবেষণা যুক্তি নির্ভর এবং গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে পরিচালিত হয়;

- কর্মসহায়ক গবেষণাই একমাত্র গবেষণা কৌশল যেখানে শ্রেণি শিক্ষক নিজে গবেষক হতে পারেন এবং স্বীয় শ্রেণি কক্ষের সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিকভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন। যার কারণে এ গবেষণাকে শ্রেণিকক্ষ গবেষণা হিসাবেও কখনো কখনো চিহ্নিত করা যায়;
- এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে একই সাথে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করা সম্ভব। গবেষণায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিভিন্ন উৎস হতে বিভিন্ন উপকরণ বা কৌশল ব্যবহার করে সংগ্রহ করা যায়। গবেষক এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন;
- কর্মসহায়ক গবেষণাকার্য একমুখী নয়। এটা বৃত্তীয়। গবেষণা একাধিক চক্রে পরিচালিত হতে পারে এবং প্রতিটি চক্রে গবেষণার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সেদিক থেকে এই গবেষণা সার্পিল প্রকৃতির;
- এই গবেষণা পরিবর্তনশীল। প্রয়োজন হলে চলমান অবস্থায় এর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণার মূল আলোকপাত হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের উপর। এর মূল ঘোষণা হচ্ছে ‘সম্পৃক্তকরণ’ এবং ভিত্তি হচ্ছে ‘গুণগত মনোন্ময়ন’;
- এই গবেষণা মূলত কার্যভিত্তিক ও পরিস্থিতি নির্ভর।
- কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে ছোট ছোট সমস্যা থেকে শুরু করে বড় আকারের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব

জনাব রহমান একটি বিদ্যালয়ের একজন ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক। তিনি দেখলেন নবম শ্রেণির বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে তুলনামূলক কম নম্বর পেয়েছে। এর ফলে ঐ শিক্ষক একটি ছোট পরিসরের কর্মসহায়ক গবেষণা হাতে নিলেন। তাঁর এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা কেন ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে কম নম্বর পেল, তা খুঁজে বের করা। তাই সমস্যাটির কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করলেন এবং সবার ব্যক্তিগত রেকর্ড কার্ড পর্যালোচনা করলেন। ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেন। তিনি অন্যান্য শিক্ষকের সাথেও উক্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া আকর্ষণীয় না হওয়াতে শিক্ষার্থীদের ব্যবসা উদ্যোগ বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, শ্রেণিকক্ষে আরও আকর্ষণীয় করে পাঠ উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবেন। তার এ কাজের প্রেক্ষিতে তিনি দেখলেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় নিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং পরবর্তী পরীক্ষায় তাদের ফলাফল আগের থেকেও ভাল হয়েছে।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা যায়। যেমন-

- শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের চলমান সমস্যা সমাধান সহজ হয়;
- পেশাদার ব্যক্তির আত্মসমালোচনার মনোভাব গড়ে ওঠে;
- কর্মস্থলে শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়;
- স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়;
- ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হয় বলে এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়;
- শিক্ষক, প্রশাসক, গবেষক সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধিত হয়;
- শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিখন বাস্তবায়নে সম্ভব হয়;
- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপ

যে কোনো গবেষণাকর্মের সুনির্দিষ্ট ধাপগুলো হলো- সমস্যা নির্বাচন তথ্য সংগ্রহ করণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন। কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রেও এ ধাপসমূহ বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতিগত দিক থেকে কর্মসহায়ক গবেষণা অন্যান্য গবেষণা থেকে ভিন্ন। কর্মসহায়ক গবেষণার লক্ষ্য হলো সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান করা। যেখানে অন্যান্য গবেষণার কর্মপরিধি সত্য উদ্ঘাটন পর্যন্ত। কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সংযোজিত ধাপ হলো সমাধানের ধাপ।

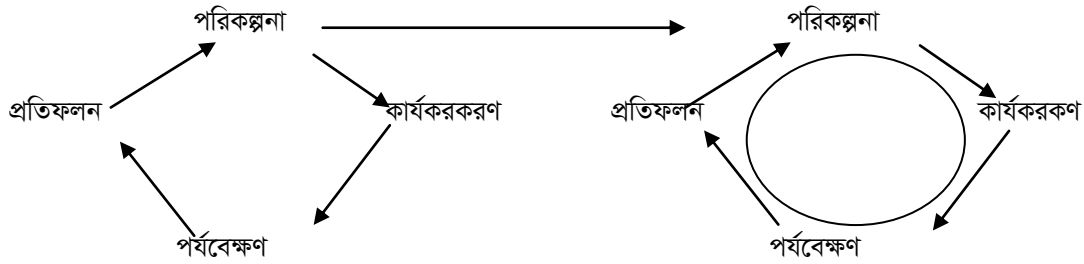
সমাজবিজ্ঞানী কার্ট লিউইনকে (Kurt Lewin) কর্মসহায়ক গবেষণার পথিকৃৎ বলা হয়। কার্ট লিউইন যুদ্ধোত্তর পরিবেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানের সচেষ্ঠ হন। তার কাজের লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানব সম্পর্ক অধ্যয়ন। মানুষ যাতে নিজেই অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ঠ হয় এ বিষয়টিকে উৎসাহিত করেন লিউইন।

সমস্যা সমাধান বা কর্মসম্পাদনে তিনি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং দলগত প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং দলগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

কার্ট লিউইন-এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল আমাদের দেশের শিক্ষকবৃন্দ তাদের শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করতে পারেন। গবেষণার কাজকে সরলভাবে বোঝার জন্য কার্ট লিউইনের মডেল একটি সহজ বোধগম্য মডেল। তাঁর এ গবেষণা মডেলকে চারটি ধাপের একটি চক্র হিসেবে দেখানো যায়। এটি আসলে চার ধাপ বিশিষ্ট গবেষণা কার্যের রূপরেখা।

প্রতিটি চক্রের চারটি ধাপ হচ্ছে-

- পরিকল্পনাকরণ
- কার্যকরকরণ
- পর্যবেক্ষণ
- প্রতিফলন



চিত্র- কার্যোন্নয়ন গবেষণার ধাপসমূহের চক্রাকারে ধারাবাহিকতা

লিউইনের নকশা অনুযায়ী এই ধাপগুলো চক্রাকারে সম্পাদিত হয়। প্রথম চক্র সম্পন্ন হওয়ার পর ২য় চক্র এবং এরপর ৩য় চক্র এভাবে গবেষণা কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া চলে।

পরিকল্পনা

কর্মসহায়ক গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই ধাপে গবেষক প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করে পরবর্তীতে কী প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত সমস্যা সমাধান করবেন তার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সমস্যা কী, কেন এই সমস্যা, কেন এই গবেষণা, কীভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়, কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায়, কীভাবে গবেষণা ফল উপস্থাপন করা যায়, এই পর্যায়ে ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। গবেষক গবেষণার প্রয়োজনে যে কোনো ধাপে গবেষণা পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে পারেন।

কার্যসম্পাদন

কর্মসহায়ক গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধাপ। এই পর্যায়ে গবেষক তার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবে গবেষণা কার্য শুরু করেন। গবেষক কাজ শুরু করার পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের (যেমন শিক্ষার্থী) বিষয়টি অবগত করবেন। নতুন কর্মের পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। কারণ অংশগ্রহণকারীদের বোধগম্যতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গবেষণা কর্মের সূষ্ঠা বাস্তবায়ন নির্ভরশীল।

পর্যবেক্ষণ

এই ধাপে গবেষক নতুন কর্ম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেন। এটি মূলত তথ্য সংগ্রহের ধাপ। গবেষক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নকৃত কার্যাবলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রত্যাশিত পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। পর্যবেক্ষণকালে গবেষক প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করেন। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য তথ্য বা উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা গবেষকের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এই লিপিবদ্ধকৃত তথ্য ও উপাত্ত গবেষকের জন্য প্রতিফলন ও আত্ম-প্রতিফলন ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

প্রতিফলন

কর্মসহায়ক গবেষণার ৪র্থ ও শেষ ধাপ হচ্ছে প্রতিফলন। এ পর্যায়ে গবেষক প্রথম ধাপ থেকে শেষ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংঘটিতব্য সম্পূর্ণ কার্যাবলি পুনঃআলোচনা ও মূল্যায়ন করেন। তার চিহ্নিত সমস্যা, সমাধানের পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন, বাস্তবায়নের পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত, তথ্য ও উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আত্মপ্রতিফলনের চেষ্টা করেন।

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা

পরিকল্পনার ছক

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক তার পেশাগত উন্নয়নের জন্য এবং শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজের উন্নয়ন সাধনের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা করতে পারেন। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্ট লিউইনের কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল অনুসন্ধান করতে পারেন।

প্রথম চক্র

বিভিন্ন ধাপ	সম্ভাব্য করণীয় কার্যাবলি	সময়
পরিকল্পনা	সমস্যা চিহ্নিত করণ: শ্রেণিকক্ষে উদ্ভূত সমস্যা থেকে একটি সমস্যা। যেমন শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা। - শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে - তাদের সুশৃঙ্খল করতে আমি কী করতে পারি	
	সমস্যার কারণ অনুমান এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান: শিক্ষকগণ অনুমান এবং শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলার পর চিহ্নিত সম্ভাব্য কারণসমূহ: - বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় নয় - অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির অনুপস্থিতি - বাস্তব উপকরণ ব্যবহার না করা	
কার্যকরকরণ	গবেষক সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করে বের করবেন এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল লিপিবদ্ধ করবেন।	
	- আমি বাস্তব উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে পারি। - আমি শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ অথবা দলগত কাজ দিয়ে শ্রেণির কাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াব। - আমি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তব উপকরণ যথাসময়ে ব্যবহার করতে পারি এবং তা করব। - আমি একসপ্তাহ ধরে এভাবে কাজ করে দেখতে পারি এবং করব।	

বিভিন্ন ধাপ	সম্ভাব্য করণীয় কার্যাবলি	সময়
পর্যবেক্ষণ	এ পর্যায়ে পরিকল্পিত প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে এবং তা পর্যবেক্ষণ করে ডাইরিতে নোট লিখতে হবে। নির্ধারিত দিন থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করা হবে এবং এ কাজের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হবে ও পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হবে।	
প্রতিফলন	এ পর্যায়ে শিক্ষক গবেষক তার কৃতকার্যাবলির মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। কর্মসহায়ক এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা যাচাই করবেন এবং তিনি প্রতিফলন অনুশীলন করবেন। পরবর্তীতে তার প্রতিফলনমূলক ফলাফল তার সহকর্মী বা বিশেষজ্ঞ গবেষকের সাথে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করবেন।	

প্রথম চক্রের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় চক্রের পরিকল্পনা করবেন।

বিভিন্ন ধাপ	সম্ভাব্য করণীয় কার্যাবলি	সময়
পরিকল্পনা	পুনঃচিহ্নিত সমস্যা	
কার্যকরকরণ	সমস্যার কারণ অনুমান এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান	
পর্যবেক্ষণ		
প্রতিফলন		

এভাবে ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক বিভিন্ন চক্রে তার কর্মসহায়ক গবেষণা পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে প্রথম দিকের চক্রের উপর পরেরগুলো নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে আগাম পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

৯.৪ শিক্ষা সফর

আমরা জানি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ। শিক্ষার এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত সকল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুসম বিকাশের জন্য এবং সামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্যই শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর জ্ঞান অর্জনই বেশি গুরুত্ব পায়। দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন বা পরিবর্তন ততটা গুরুত্ব পায় না। বর্তমানে শিক্ষার এ সীমাবদ্ধতা কাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যই ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে শিক্ষা সফর অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

শিক্ষা সফর হলো শিক্ষামূলক ভ্রমণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিবেশের বাইরে গিয়ে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বিভিন্ন সামাজিক অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা স্থানে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে নিয়ে হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করার নাম শিক্ষা সফর। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণযোগ্য। শিক্ষক কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক খামারে অথবা কোনো শিল্প কলকারখানায় কিংবা কোনো উল্লেখযোগ্য স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করতে পারেন। যেখানে শিক্ষার্থীদের বাস্তব পরিবেশে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বিষয়ের ধারণা স্পষ্টকরণ সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতার উন্নয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন সম্ভব।

শিক্ষা সফরের গুরুত্ব

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের জন্য শিক্ষা সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সফরের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর একঘেয়েমি ও অবসন্নতা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে;
- দলগতভাবে কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়;
- শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে;
- তত্ত্ব ও বাস্তবের মিলকরণের প্রেক্ষিতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন সহজ হয়;
- শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয়;
- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহায়তা দান ইত্যাদি মানবিক দিক বিকশিত হয়;
- শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে;
- নৈতিক চরিত্রের বিকাশ ঘটায়;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়;
- ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করে।

শিক্ষা সফর বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা

শিক্ষা সফরের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যেমন-

- সময় সমন্বয়ের সমস্যা;
- শিক্ষকের অনীহা;
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা;
- অর্থের অপরিপূর্ণতা;
- অভিভাবকদের অনীহা।

প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

- প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে;
- ছুটির দিনে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা যেতে পারে;
- শিক্ষক, প্রশাসক ও অভিভাবকদের আন্তরিক সদিচ্ছার মাধ্যমে শিক্ষা সফরের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ করা সম্ভব।

শিক্ষা সফর পরিকল্পনা

শিক্ষা সফরের জন্য করণীয় নিম্নরূপঃ

- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় প্রশাসনের মতবিনিময় ও কার্যকর পরিকল্পনাকরণ,
- অভিভাবকগণকে অবহিতকরণ;
- বিষয়বস্তু ও স্থান নির্বাচন;
- বাজেট প্রণয়ন;
- সফরের স্থান পরিদর্শন ও যোগাযোগ স্থাপন;
- তারিখ ও সময় নির্দিষ্টকরণ;
- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে বিভক্তকরণ;
- শিক্ষার্থীদের করণীয় কাজ নির্দিষ্টকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের ধারণা প্রদান;
- প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ।

সুতরাং ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ের শিক্ষাসফর অত্যাৱশ্যক।

অনুশীলনের জন্য প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ক) ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কী?
- খ) কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যাখ্যা করুন।
- গ) প্রতিফলন অনুশীলনের ৪টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
- ঘ) “কাজের উপর প্রতিফলন” কথাটি বুঝিয়ে লিখুন।
- ঙ) কর্মসহায়ক গবেষণা কী?
- চ) কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপসমূহ লিখুন।
- ছ) শিক্ষা সফরের জন্য করণীয় কার্যের তালিকা তৈরি করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। ক. ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কেন প্রয়োজন?
 - খ. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য করণীয় দিকসমূহ লিখুন।
- ২। ক. প্রতিফলন অনুশীলন কী? প্রতিফলন অনুশীলনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।
 - খ. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষকের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন কেন প্রয়োজন?
- ৩। ক. কর্মসহায়ক গবেষণা কী?
 - খ. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষক কীভাবে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিকল্পনা করবেন বিস্তারিত লিখুন।

গ্রন্থপঞ্জি

- মালেক, মরিয়ম, ইসলাম ও রিয়াদ (২০১৮), শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, সপ্তম সংস্করণ, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৭), ব্যবসায় উদ্যোগ, নবম-দশম শ্রেণি, ঢাকা।
- চৌধুরী, পারভেজ, রিয়াদ, শেখ ও গমেজ, কমল (২০১৪), ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, প্রথমপত্র (ব্যবসায় সংগঠন), পি আর কে পাবলিশার্স, ঢাকা।
- চৌধুরী, পারভেজ, রিয়াদ, শেখ ও গমেজ, কমল (২০১৪), ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, দ্বিতীয় পত্র (ব্যবস্থাপনা) পি আর কে পাবলিশার্স, ঢাকা।
- বানু, সেলিনা, খাইরুল ইসলাম (২০১২), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রসঙ্গ, ঢাকা; প্যাপিরাস।
- জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা,
- সেসিপ, (২০১২) জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন মাস্টার ট্রেনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ঢাকা; এনসিটিবি।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (২০১২), সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ঢাকা।
- এনসিটিবি (২০১২) মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম, ঢাকা।
- হোসেন, আমজাদ (২০১২), আবশ্যিকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, টিকিউআই-সেপ, ঢাকা।
- কুণ্ডু, জয়দেব (২০১১), ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ।
- হামিদ, মোহাম্মদ আব্দুল (২০১০) শিল্পোদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা
- রায়, সুশীল (২০০৮), শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, কোলকাতা; মোমা বুক এজেন্সি।
- টিকিউআই (২০০৮), শিখন মূল্য যাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন, বি এড মডিউল, ঢাকা।
- টিকিউআই (২০০৮), কর্মসহায়ক গবেষণা, বি এড মডিউল, ঢাকা।
- টিকিউআই (২০০৮), সামাজিকবিজ্ঞান শিক্ষণ, বি এড মডিউল, ঢাকা।
- টিকিউআই (২০০৮), ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ, বি এড মডিউল, ঢাকা।
- টিকিউআই (২০০৮), বাণিজ্যিক ভূগোল শিক্ষণ, বি এড মডিউল, ঢাকা।
- আলাউদ্দিন, মো. (২০০৮), ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা
- মাইতি, শ্যামলেশ (২০০১) ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়নের রূপরেখা, ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, কলকাতা,
- খান, লুৎফর রহমান ও মালেক, আব্দুল (২০০০), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

- P. Narayana Reddy (2011) Entrepreneurship : Text and Cases, Cengage Learning India Pvt.Ltd. Delhi
- Vasant Desai (2013) Entrepreneurial Development: Potential Beyond Boundaries, Himalaya Publishing House, New Delhi
- Khan, A R (2013) Entrepreneurship, Small Business and Lives of Successful Entrepreneurs, Brothers' Publications, Dhaka
- Rao D. F. Kuratko, T. V. (2013) Entrepreneurship : A South-Asian Perspective, Cengage Learning India Pvt. Ltd., India, pp 4-5